ভলিউম ২৫

কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

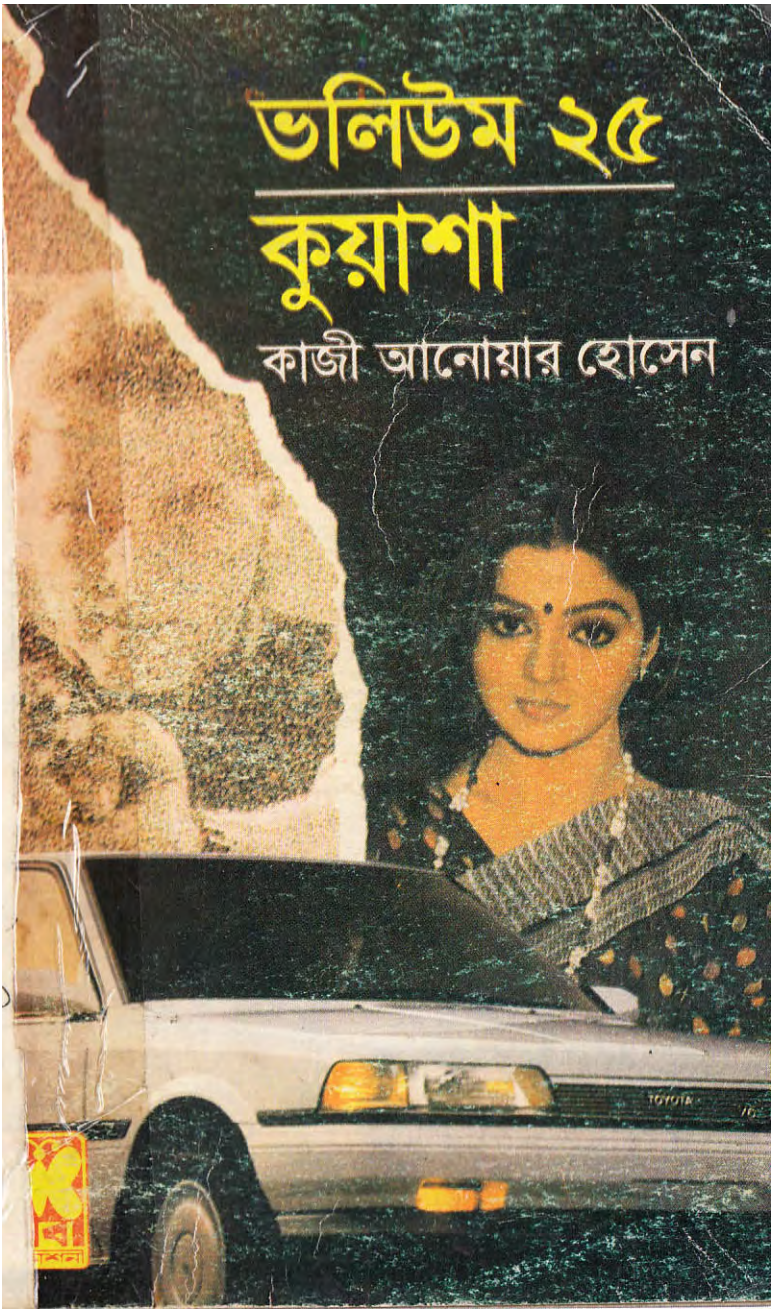

কুয়াশা ৭৩

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭৭

এক

সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করল ঘটনাটা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি বা ব্যাঙ্ক ডাকাতি মাঝে মধ্যেই হয়। কিন্তু নগদ বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে স্বয়ং ব্যাঙ্ক ম্যানেজার লাপাত্তা, এ ধরনের ঘটনা সচরাচর ঘটে না। দু'দশ হাজার বা বড়জোর লাখ দু'লাখ টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কের কোন কর্মচারী গায়েব হয়ে গেছে, এরকম ঘটনা ঘটেছে এর আগে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে সে-কর্মচারী ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে, খোয়া যাওয়া টাকার বেশির ভাগ উদ্ধার করা গেছে। এক্ষেত্রে দুটোর কোনটাই ঘটল না। ম্যানেজারকে তো সারা দেশময় তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল না। বিশ লক্ষ টাকারও কোন সন্ধান মিলল না।

স্বর্ণালী ব্যাঙ্ক দেশের প্রধান ব্যাঙ্কগুলোর অন্যতম। পাঁচশোর উপর শাখা রয়েছে স্বর্ণালীর সারা দেশে। নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রধান শাখার ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছিলেন আবদুর রহিম। বছর পাঁচেক চাকরি করছেন তিনি। বিচক্ষণ, বাকপটু এবং মিশুক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। পেশাগত দিক থেকে তিনি কুশলী ছিলেন। বয়স অল্প, মাত্র একত্রিশ বছর হলেও, ম্যানেজার হিসেবে কাজ চালাবার জন্যে তাঁর যথেষ্ট উপযুক্ততা ছিল। আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ ছিল না তাঁর। বিয়েও করেননি। বিয়ে

সংক্রান্ত ব্যাপারে কথাবার্তা যদি কখনও বন্ধু-বান্ধবরা তুলত, আবদুর রহিম বলতেন, 'বিয়ে করে বউকে খাওয়াব কি? যা মাইনে পাই, তা দিয়ে নিজেরই তো হয় না।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বেতনের টাকায় সত্যিই তাঁর চলত না। অফিস ছুটির পরও তিনি কাজ করতেন। অমানুষিক পরিশ্রম করতেন তিনি। কাজ শেষ হলে, সোজা চলে যেতেন কোন বার বা রেস্তোরাঁয়। প্রায় নিয়মিত মদ্য পান করতেন। নাচ-গান ভালবাসতেন। মাঝে মধ্যে বড় বড় হোটেলে জুয়া-টুয়াও খেলতেন। সে যাই হোক, আবদুর রহিম সাহেব যে তাঁর এতদিনের সুনাম স্বেচ্ছায় ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে এমন একটা গর্হিত কাজ করে বসবেন, তা কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

সেদিন ছিল শনিবার। ব্যাঙ্কে জামানতের পরিমাণ ছিল বাইশ লাখ টাকার মত। লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল একটার পর। চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এখলাসউদ্দীন হিসেব মিলিয়ে চলে গেলেন বেলা সাড়ে তিনটের সময়। দু'জন কেরানীও গেল তাঁর সাথে। ক্যাশিয়ার গেল চারটের সময়।

ব্যাঙ্কে রইলেন ম্যানেজার আবদুর রহিম এবং দারোয়ান জয়নাল মিয়া। সাধারণত, হেড অফিসে টাকা পাঠাবার প্রয়োজন হলে, ফোন করে ঢাকা থেকে মাইক্রোবাস পাঠাবার অনুরোধ করা হয়। প্রতি শনি এবং বুধবার দিন টাকা পাঠানো হয় হেড অফিসে। তবে, এটা কোন বাঁধাধরা নিয়ম নয়। কোন কোন বুধ বা শনিবারে জামানতের টাকার পরিমাণ খুবই অল্প হয়, সে-সব দিনে হেড অফিসে ফোন করে মাইক্রোবাস পাঠাবার অনুরোধ করা হয় না।

তবে, সপ্তাহের ওই দু'দিন মাইক্রোবাসের জন্যে ফোন করা না হলে, হেড অফিসের চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট খোঁজ নিয়ে জেনে নেন, টাকা কেন পাঠানো হলো না। নারায়ণগঞ্জ থেকে তখন আবদুর রহিম জবাব দেন, টাকা তেমন জমা পড়েনি।

সেদিনও হেড অফিস থেকে চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফোন করলেন, 'রহিম সাহেব, কি ব্যাপার? মাইক্রোবাস পাঠাতে হবে না আজ?'

ম্যানেজার রিস্টওয়াচের দিকে চোখ রেখে ফোনে বললেন, 'টাকা জমা পড়েনি বললেই চলে। শুধু তোলাতুলির ব্যাপার। সম্ভবত কাল সকালে আপনাদের ওখান থেকে বেশ কিছু টাকা আমদানী করতে হবে।'

ব্যস্ত মানুষ চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, দু'এক কথায় পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যেতে নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিলেন ফোন।

এদিকে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবদুর রহিম জোর গলায় হাঁক ছাড়লেন, 'জয়নাল মিয়া!'

দারোয়ান ছুটে এল।

'নাইট গার্ড কখন আসবে?' জানতে চাইলেন ম্যানেজার।

'সাড়ে পাঁচটায়, স্যার।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন ম্যানেজার। পাঁচটা বাজে।

'ঠিক আছে, তুমি চলে যাও। আজ আর হেড অফিসে টাকা পাঠানো হবে না, হিসেবে বড় রকমের গরমিল দেখা দিয়েছে। নাইট গার্ড না আসা পর্যন্ত আমি আছি।'

কথাগুলো বলে তিনি খোলা ফাইলে মনোনিবেশ করার ভান করলেন। কিন্তু দারোয়ান এতটুকু নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল

সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

দারোয়ান জয়নাল মিয়া ভাবছিল, স্যারের হলো কি আজ? আজ পাঁচ বছর স্যারকে দেখছে সে, কোনদিন তো একথা বলেননি। যতক্ষণ তিনি অফিসে থাকেন, তাকেও থাকতে হয়। বারবার করে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন, এখনও দেন—আমি যতক্ষণ অফিসে থাকব, তোমাকেও থাকতে হবে, ডিউটি শেষ হোক বা না হোক। আজকে চলে যেতে বলার অর্থ?

'দাঁড়িয়ে রইলে যে?' মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন আবদুর রহিম।

'স্যার, আপনি একা থাকবেন···।'

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি না গতকাল বলছিলে তোমার ছোট ছেলের জণ্ডিস হয়েছে? এখানে তো আর কোন কাজ নেই, বাড়ি গিয়ে ছেলের যত্ন নাও।'

চলে যেতে বলার কারণটা বুঝতে পেরে প্রৌঢ় জয়নাল কৃতজ্ঞ বোধ করল। চট্ করে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম করল সে, বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে চেম্বার থেকে।

দারোয়ানকে বিদায় করে দিয়ে আবদুর রহিম ব্যাঙ্কের সদর গেট বন্ধ করলেন। ভল্টের সামনে এসে কমবিনেশন কোড নাম্বার মিলিয়ে তালা খুললেন তিনি। অ্যাটাচিকেসে ভরলেন পাঁচশো আর একশো টাকার নোটগুলো। অ্যাটাচিকেসে তালা দিয়ে চাবি রাখলেন পকেটে। ভল্টের তালাও বন্ধ করলেন। গেট খুলে দিয়ে ফিরে এসে বসলেন তিনি নিজের চেম্বারে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এল নাইট গার্ড খুরশীদ। তাকে সাথে নিয়ে জানালা-দরজা পরীক্ষা করলেন আবদুর রহিম নিত্য দিনের নিয়ম মত।

সব ঠিকঠাক আছে দেখে নাইট গার্ডকে ব্যাঙ্কের ভিতর রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন, ব্যাঙ্কের সদর দরজায় তালা লাগালেন বাইরে থেকে।

এই-ই নিয়ম। নাইট গার্ড রাত্রে ব্যাঙ্কের ভিতরই থাকে। আগামীকাল রবিবার, সারাটা দিনও তাকে থাকতে হবে বন্দী হয়ে। খাবার দাবার সাথে করে নিয়ে এসেছে সে।

সদর গেটে তালা লাগিয়ে হাঁটা ধরলেন আবদুর রহিম। অন্যান্য দিন রিকশা নেন। আজ নিলেন না। হাতে অ্যাটাচিকেস নিয়ে শহরের জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখার ম্যানেজার আবদুর রহিম।

হারিয়ে গেলেন মানে সত্যিই হারিয়ে গেলেন। ঠিক যেন বাতাসের সাথে মিশে গেলেন তিনি। কেউ আর তাঁর কোন খোঁজই পেল না।

সোমবার সকাল ন'টার আগেই একে একে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ব্যাঙ্কের সামনে এসে পৌঁছল। সবার শেষে পৌঁছল ক্যাশিয়ার এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সাড়ে ন'টা বাজল। দেখা নেই ম্যানেজারের। ক্যাশিয়ার জহিরউদ্দীন কাছের একটা দোকান থেকে ফোন করল ম্যানেজার আবদুর রহিমের বাড়িতে। একবার নয় কয়েকবার ডায়াল করল সে। কিন্তু ফোন কেউ ধরল না।

ক্যাশিয়ার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল ব্যাঙ্কের সামনে। আর বিশ মিনিট পর লোকজন টাকা তুলতে এবং জমা দিতে আসবে ব্যাঙ্কে। এদিকে ব্যাঙ্কের চাবি রয়েছে ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজারকে ফোনে পাওয়া যায়নি। বাড়িটাও তাঁর বেশ দূরে, গিয়ে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। একটা চাবি অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে থাকত, কিন্তু সে বেশ কিছুদিন ছুটিতে থাকার পর মাত্র দিন দুয়েক আগে জয়েন করেছে, তার

চাবিটা ম্যানেজারের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া হয়নি এখনও।

কি করা! ভেবেচিন্তে ওরা সিদ্ধান্ত নিল, হেড অফিসে খবর পাঠানো দরকার।

হেড অফিসে খবর গেল। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এলেন চীফ সিকিউরিটি অফিসার এবং ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজার স্বয়ং।

মাস্টার কী সাথে আনলেন তাঁরা। ব্যাঙ্ক খোলা হলো।

ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজার নির্দেশ দিলেন, 'ব্যাঙ্কের কাজ স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যান।'

কথাটা বলে তিনি ম্যানেজারের চেম্বারে গিয়ে বসলেন। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করলেন ম্যানেজারের বাড়িতে। ইতোমধ্যে দারোয়ানকে সাথে দিয়ে তিনি চীফ সিকিউরিটি অফিসারকে ম্যানেজারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ডি. জি. এম. অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডাকলেন।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট ক্যাশিয়ারকে সাথে নিয়ে ঢুকল চেম্বারে।

ডি. জি. এম. প্রশ্ন করলেন, 'শনিবারে কি রকম টাকা জমা পড়েছিল?'

'বাইশ লাখের মত।'

চমকে উঠলেন ডি. জি. এম, 'বলেন কি! তবে যে চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বললেন, রহিম সাহেব তাকে শনিবারে ফোনে বলেছেন জমার পরিমাণ খুবই অল্প?'

'না তো! গত কয়েক মাসের মধ্যে এত টাকা আর কোন দিন জমা

পড়েনি।' বলল ক্যাশিয়ার।

'নিয়ে আসুন দেখি ক্যাশবুক?' গম্ভীরভাবে বললেন ডি. জি. এম।

ক্যাশবুক দেখে সত্য জানা গেল। সাথে সাথে ডাকা হলো পুলিস। পুলিস ইন্সপেক্টর এনায়েত করিম কয়েকজন কনস্টেবলকে সাথে নিয়ে হাজির হলেন দশ মিনিটের মধ্যে। এরপর হেড অফিস থেকে এসে পড়লেন স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার।

সকলের সামনে খোলা হলো ভল্ট। টাকা পাওয়া গেল যা তার পরিমাণ লাখ আড়াইয়ের বেশি নয়। সবই এক, পাঁচ, দশ টাকার নোট এবং খুচরো পয়সা। একশো এবং পাঁচশো টাকার একটা নোটও নেই।

পরদিন রাজধানীর সকল সংবাদপত্রে খবরটা বেরোল। দেশের মানুষ জানল, বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আবদুর রহিম পালিয়েছেন।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে সেদিনের খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল শহীদ। মহুয়া এল ধূমায়িত চা-এর কাপ হাতে নিয়ে। তেপয়ে কাপ নামিয়ে রেখে স্বামীর পাশে বসল ও। ঠিক সেই সময় শোনা গেল কান ফাটানো ভট্ ভট্ ভট ভট্ শব্দ।

মোটর সাইকেল।

মুচকি হেসে শহীদ একবার তাকাল শুধু মহুয়ার দিকে। মহুয়াও একটু হাসল। পনেরো বিশ সেকেণ্ড পরই হৈ-হৈ করতে করতে ড্রয়িংরুমে ঢুকল কামাল।

মহুয়া সাদর সম্ভাষণ জানাল, 'এসো, কামাল। অমন ঝড়ের বেগে মোটর সাইকেল চালিয়ে এলে যে?'

কামাল এগিয়ে এসে দাঁড়াল হতাশ ভঙ্গিতে, বলল, 'এত চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। পেট্রলটুকু বাজে খরচই হলো দেখছি।' কথাটা বলল সে শহীদের হাতে চা-এর কাপের দিকে চোখ রেখে।

'শেষ রক্ষা করতে পারলে না মানে?'

'ভেবেছিলাম তোমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ হবার আগেই পৌঁছুতে পারব…।'

হেসে ফেলল মহুয়া।

শহীদও হাসছে, তবে মনে মনে। কাগজের দিক থেকে চোখ সরায়নি ও।

মহুয়া সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাঁড়াও, আনছি। তোমার জন্যে আলাদা করে রাখা আছে সব।'

'সব? যেমন?'

'বাটার টোস্ট, জেলী, একহালি হাফবয়েল ডিম, দু'পীস ফ্রুট কেক, এক জোড়া সাগর কলা, এক পিরিচ ফিরনি, দুটো মনসুরা, আধ পোয়া ছানা, এক গ্লাস হরলিকস…।'

কামাল হাত তুলে থামিয়ে দিল মহুয়াকে, 'ব্যস, ব্যস, মহুয়াদি—আর দিয়ো না। তুমি তো জানো, অত খেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারি না।'

মহুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আরও দুটো আইটেম আছে। গলায় আঙুল দিয়ে জোর করে খাওয়াব, এত কষ্ট করে তৈরি করে রেখেছি কেন তাহলে!'

মহুয়া কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল

কামালের মধ্যে। হাসিখুশি ভাবটা মুহূর্তে উবে গেছে, গম্ভীর হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা।

'তোর কি মনে হয়, ধরা পড়বে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল হঠাৎ কামাল। শহীদও যেন এই ধরনের একটা প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করছিল, 'এর আগে পুলিস এ ধরনের অপরাধীকে ধরেছে। তবে তারা কেউ এত টাকা নিয়ে যায়নি। ম্যানেজার আবদুর রহিমকে আমার খুব ধুরন্ধর লোক বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয়, পরবর্তী কর্মপন্থা অনেক আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে সে, যাতে নিখুঁতভাবে পুলিসকে ফাঁকি দেয়া যায়।'

'ঘুম থেকে উঠে কাগজে খবরটা পড়েই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। দু'চারশো বা দু'চার হাজার টাকা নয়, বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দিব্যি চম্পট দিল—এ অসহ্য! মাঝখানে দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে কোথায় কতদূর চলে গেছে সে টাকা নিয়ে কে জানে! যাবি একবার ব্যাঙ্কে?'

'লাভ?'

'যেখান থেকে টাকা গেছে, জায়গাটা একবার দেখলে হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে···।'

'সূত্র আবার কি? লোকটা তো কাজটা করে নিজের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করেনি। সূত্র দরকার হত, যদি সে টাকা চুরি করে অন্য কারও ঘাড়ে অপরাধটা চাপাবার চেষ্টা করত।'

'আমাদের কি তাহলে কিছুই করার নেই বলতে চাস?'

'আছে। তবে, এখুনি নয়। দেখাই যাক না, পুলিস কতদূর কি করতে পারে।'

মহুয়া এল, পিছনে খাবার সাজানো ট্রে নিয়ে লেবু। কামালের

সামনে ট্রে নামিয়ে রেখে লেবু চলে যেতেই কামাল ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারদাবারের ওপর।

মহুয়া কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ওই আমার সতীন আসছেন।'

'কে?' মুখের ভিতর খাবার থাকায় বিকৃত শোনাল কামালের কণ্ঠস্বর।

মহুয়া বলল, 'কে আবার, লালমুখো গোরা!'

তার মানে, মি. সিম্পসন। মহুয়ার কথা শেষ হতে না হতে দরজায় দেখা গেল সি. আই. ডি-র স্পেশাল অফিসার মি. সিম্পসনকে।

সহাস্যে এগিয়ে এলেন তিনি। উঠে দাঁড়াল শহীদ। করমর্দন করল।

কামাল খাওয়ার কাজে বিরতি না দিয়েই বলল, 'বসুন, মি. সিম্পসন, বসুন। খবর কি বলুন তো?'

বসতে বসতে মি. সিম্পসন বললেন, 'খবরটা তো কাগজেই দেখেছ।'

শহীদ বলল, 'সন্ধান পেলেন আবদুর রহিমের?'

'যাবে কোথায়? ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

শহীদ বলল, 'দেশ ছেড়ে ইতিমধ্যে যদি পালিয়ে…!'

'অসম্ভব, শহীদ। আমরা এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন, বর্ডার—এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চেক করিনি। আবদুর রহিমের মত দেখতে কোন লোককে কেউ যেতে দেখেনি। আছে সে দেশের ভিতরই। এবং আমার বিশ্বাস, দেশের বাইরে যাবার কোন উদ্দেশ্য তার নেই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'অত টাকা—দেশের বাইরে নিয়ে গিয়ে করবে কি সে? গেলেও

টাকাটা ডলার বা পাউন্ডে রূপান্তরিত করে তবে যাবে। সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।'

শহীদ তার পাইপে এরিনমোরের টোবাকো ভরতে শুরু করল, 'একটু আগে কামালকে বলছিলাম, লোকটাকে আমার ধুরন্ধর বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ লোভে পড়ে কাজটা সে করে ফেলেছে বলে মনে হয় না। অনেক দিনের পরিকল্পনা ছিল তার।'

'তুমি বলতে চাইছ, লোকটাকে ধরা খুব একটা সহজ হবে না?'

'আমি বলতে চাইছি, পুলিস যাতে তাকে ধরতে না পারে সেজন্যে সুন্দর একটা ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছে সে।'

মি. সিম্পসন হাতের পাইপটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমরা আশা করছি, আগামী দু'চারদিনের মধ্যেই ধরা পড়বে সে।'

শহীদ পাইপে অগ্নিসংযোগ করল, ধোঁয়া ছাড়ল গলগল করে, 'সেক্ষেত্রে বলব, লোকটা সাধারণ একজন অপরাধী।'

এতক্ষণে কামাল কথা বলল, 'এবং সাধারণ অপরাধীদের সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোন আগ্রহ নেই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু যদি প্রমাণ হয় লোকটা অসাধারণ? সেক্ষেত্রে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য আশা করতে পারি, শহীদ?'

মহুয়া মৃদু হেসে বলল, 'বাপরে বাপ, কী বুদ্ধি আপনার! দরকার পড়লেই যাতে এদেরকে কাজে লাগাতে পারেন, সেজন্যে এখনই অগ্রিম প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিচ্ছেন।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'ধরা পড়ে গেলাম দেশের শ্রেষ্ঠতম প্রাইভেট

ডিটেকটিভের ওয়াইফের কাছে—হাউ-এভার শহীদ, আশা করতে পারি সাহায্য?'

'লোকটাকে যদি শেষ পর্যন্ত ধরতে না পারেন, অবশ্যই আমরা শেষ চেষ্টা করব। বিশ লক্ষ টাকা হজম করবে সে, এ হতে দিচ্ছি না!'

'থ্যাঙ্কিউ মাই বয়!'

দুই

নিঝুম রাত্রি। কোথাও জেগে নেই একটি প্রাণী। রাস্তার ধারে লাইটপোস্টের মাথা থেকে চুরি হয়ে গেছে বালব, ফলে চারদিকে জমাট বেঁধে আছে নিকষ কালো অন্ধকার। দু'পাশে বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ, শুধু খোলা রয়েছে এ-পাড়ার লাল বাড়িটার উপরতালার একটি জানালা। সেই জানালা পথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলোর আভা।

একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি অন্ধকার গলির মোড়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে বাতাসে ভর করে ভেসে এল দুটো বাজার ঘণ্টাধ্বনি ঢং ঢং। ছায়ামূর্তি পা বাড়াল।

আলো জ্বলছে পাগলা বিজ্ঞানী প্রফেসার রেহমানের কামরায়। পঞ্চাশের উপর বয়স পাগলা বিজ্ঞানীর। দাড়ি চুল সব ধবধবে সাদা। কপালে বলিরেখা ফুটে আছে। বিজ্ঞানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এই পাগল মানুষটি রাত্রে ঘুমান না, দিনেও ঘুমান না। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে ঘুমাতে দেখেনি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গবেষণা করে চলেছেন তিনি। চিকিৎসা শাস্ত্রে এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রি আছে।

নিউরো সার্জেন এবং প্লাস্টিক সার্জারিতেও সিদ্ধহস্ত।

ইদানীং কাজের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছেন প্রফেসার রেহমান। তাঁর পঁচিশ বছরের সহধর্মিণী, যাঁকে তিনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, অকস্মাৎ ব্রেস্ট ক্যান্সারে মাস তিনেক আগে মারা গেছেন। ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি স্ত্রীর মৃত্যুতে। কিন্তু একমাত্র কন্যা লুবনার কথা ভেবে নিজেকে সামলে নিয়েছেন তিনি। অথচ, কিছু দিন কাটতে না কাটতে লুবনার কথাও ভুলে গেছেন তিনি। মগ্ন হয়ে পড়েছেন কাজে।

লুবনা বড় হয়েছে। ভার্সিটিতে পড়ে সে। তার দুঃখ, বাবার সেবা করার কোন সুযোগ তার নেই। ল্যাবরেটরিতে ঢোকার অনুমতি দেন না প্রফেসার রেহমান কাউকে, একমাত্র মেয়েকেও না। বুড়ো সিদ্দিক মিয়া বাড়ির বাজার করা, রান্না করা থেকে শুরু করে যাবতীয় সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করে। বাড়িরই এক কোণে পড়ে থাকে সে। লুবনা বা সিদ্দিক মিয়া আজ পর্যন্ত উঁকি মেরে দেখার সুযোগও পায়নি ল্যাবরেটরি। প্রফেসার রেহমানের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম। যে ক'জন আছেন, যদি কখনও আসেন, বসেন ড্রয়িংরুমে। ব্যতিক্রম শুধু একজন। প্রফেসার রেহমান তাকে বন্ধু বলে মনে করেন না, বয়সে ছোট হলেও মনে করেন গুরু। সেই গুরুকেই একমাত্র তিনি সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ল্যাবরেটরির ভিতর।

গভীর নিস্তব্ধতা চারদিকে।

মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে টেস্টটিউবের তরল পদার্থ পরীক্ষা করছেন প্রফেসার রেহমান। ক্যান্সারে মারা গেছেন তাঁর স্ত্রী, তাই তিনি ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করছেন। হঠাৎ তাঁর কানে একটা শব্দ ঢুকল।

ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাল তাঁর। কান পাতলেন খানিক। আর কোন শব্দ হলো না বলে ভাবলেন ভুল শুনেছেন। শব্দ হবেই বা কেন! গত পরশু লুবনা গেছে বান্ধবীদের সাথে কক্সবাজারে বেড়াতে। সিদ্দিক মিয়া আছে কিচেনরুমে, কলিংবেল টিপে না ডাকলে ল্যাবরেটরির কাছাকাছিও আসবে না সে।

কাজে মন দেন প্রফেসার। মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে খসখস করে কাগজে নোট লেখেন। টেস্টটিউবে রাসায়নিক দ্রব্য মেশান, আবার চোখ রাখেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে।

দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি পানির পাইপ বেয়ে উঠে পড়েছে দোতলার খোলা জানালার সামনে। জানালা দিয়ে প্রফেসারকে দেখতে পাচ্ছে সে। পিছন ফিরে বসে আছেন প্রফেসার।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে খুলে ফেলল জানালার শার্সি। জানালা গলে ল্যাবরেটরির মেঝেতে নামল সে। দু'পকেটে হাত দিয়ে এগোল নিঃশব্দ পায়ে।

প্রফেসার রেহমানের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি।

'প্রফেসার রেহমান!'

চমকে উঠলেন প্রফেসার। ভয়ে নয়, বিরক্তি ভরে চরকির মত ঘুরে বসলেন তিনি, 'কে?'

ছায়ামূর্তি তার মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলেছে। প্রফেসার তার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর, ধীরে ধীরে তিনি ফিরে এলেন বাস্তবে। অবিশ্বাস ভরা গলায় বললেন, 'রহিম সাহেব, আপনি? এখানে কেন এসেছেন? ঢুকলেন কিভাবে?'

আবদুর রহিম বলল, 'খবরটা তাহলে জানেন?'

প্রফেসার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। কিন্তু পা বাড়ালেন না। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, 'এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যান আপনি, রহিম সাহেব। আপনি চোর, আপনার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে।'

বাঁকা হাসল রহিম সাহেব। বলল, 'এতদিনের পরিচয় আপনার সাথে আমার, কত চা খাইয়েছি, কত গল্প করেছি, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কত ঝামেলা থেকে আপনাকে রক্ষা করেছি—আজ আমার বিপদের দিনে আপনি এমন ব্যবহার করবেন?'

'আপনি চোর। আপনার এই পরিচয়টাই আমার কাছে বড়। বেরিয়ে যান বলছি, তা নয়তো আমি পুলিস ডাকব।'

'ধরিয়ে দেবেন আমাকে?'

'সেটাই আমার কর্তব্য। কিন্তু ঝামেলায় জড়াতে চাই না। আরও বড় কাজে ব্যস্ত এখন আমি। যান আপনি।'

আবদুর রহিম বলল, 'মাস পাঁচেক আগে আপনি বলেছিলেন, লাখ তিনেক টাকা লোন চান ব্যাঙ্ক থেকে, মনে আছে? তখন লোন দেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল, তাই ব্যবস্থা করতে পারিনি। প্রফেসার রেহমান, সেই তিনলাখ টাকা এখন আপনি পেতে পারেন।'

'টাকার এখনও দরকার আছে আমার। কিন্তু আপনার মাধ্যমে তা আমি নেব না। তাছাড়া, আপনি লোনের ব্যবস্থা করবেন কিভাবে? আপনার তো ধরা পড়লে জেল হবে চোদ্দ বছরের।'

'ব্যাঙ্ক থেকে নয়, লোনটা আমিই আপনাকে দিতে চাই।'

প্রফেসার রেহমান বিরক্তির সাথে বললেন, 'কেন? তাছাড়া, আপনার কাছ থেকে লোন নেবই বা কেন আমি?'

আবদুর রহিম বলল, 'আপনি মহৎ মানুষ, আমি জানি। মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। আমি অধম, পাপী। আপনাকে সাহায্য করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই খানিকটা। দয়া করে যদি লাখ তিনেক টাকা আপনি আমার কাছ থেকে নেন, খুব খুশি হব। যখন ইচ্ছা দেবেন, না দিতে পারলে দেবেন না।'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে কথা বলছে স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখার প্রাক্তন ম্যানেজার আবদুর রহিম।

প্রফেসার কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আবদুর রহিমের দিকে। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে কি ভেবেছেন আপনি? আমি কি এতই নিচে নেমে গেছি যে একটা চোরের কাছ থেকে টাকা সাহায্য নেব? আপনি চলে যান, এই শেষবার বলছি।'

আবদুর রহিম শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'প্রফেসার রেহমান, প্লীজ, টাকাটা আপনাকে নিতেই হবে…।'

'না! বেরোন!' ধমক মেরে দরজার দিকে আঙুল দেখালেন প্রফেসার।

পিছিয়ে গেল আবদুর রহিম। বসল ধীরে সুস্থে একটা চেয়ারে কোটের পকেট থেকে বের করল একটা এনভেলপ এবং সিগারেটের প্যাকেট। এনভেলপটা রাখল উরুর উপর। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল।

প্রফেসার রাগে কাঁপছেন লোকটার স্পর্ধার নমুনা দেখে।

'আচ্ছা, যুক্তিতে আসুন। আপনি আমার কাছ থেকে টাকা নেবেন না কেন?'

'আপনি চোর, তাই।'

'টাকার গায়ে কি লেখা থাকে, চোরের টাকা?'

প্রফেসার বললেন, 'তা থাকে না। কিন্তু আমি নিলে, আমার মনে লেখা হয়ে যাবে। তাছাড়া, কারও সাহায্য আমি নেব কেন?'

'সাহায্য কে বলল? টাকাটার বদলে আপনি একটা কাজ করে দেবেন। কাজটার বদলে টাকাটা নেবেন।'

'কাজ! কি কাজ?'

আবদুর রহিম বলল, 'সামান্য একটা কাজ। কিন্তু আগে আপনি শান্ত হোন। অমন মারমুখো হয়ে থাকলে ঠাণ্ডা মাথায় আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করবেন কিভাবে? প্রফেসার রেহমান, আমি আপনার উপকারের জন্যেই এসেছি। কথাটা মনে রেখে আমার প্রস্তাব বিবেচনা করুন। যে কাজটা আপনাকে করতে হবে তার বদলে আপনি বড় জোর পঁচিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে তিন লক্ষ টাকা দেব। কারণ আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি আপনি মানুষের উপকারের জন্যে গবেষণা করে চলেছেন। আপনাকে টাকা দিলে সে টাকা দশের উপকারের জন্যেই ব্যয় হবে···।'

'থামুন! একজন চোরের মুখ থেকে বড় বড় কথা আমি শুনতে চাই না। আপনার প্রস্তাবটাও আপনি নিজের কাছে রাখুন, শুনতে চাই না। দয়া করে বিদায় হোন এবার···।'

'প্রস্তাবটা শুনুন আগে।'

'না!'

আবদুর রহিম হাসল ঠোঁট বাঁকা করে, 'আপনাকে একটা কথা আগেই বলা উচিত ছিল আমার। এখন বলি, প্রফেসার রেহমান, শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনিই আমার প্রস্তাব মেনে নেবার জন্যে উন্মাদ হয়ে

উঠবেন। আপনাকে রাজি করাবার জন্যে একাধিক অস্ত্র আমার হাতে আছে।'

'কি বলতে চান?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে আবদুর রহিম বলল, 'আস্তে। রাস্তা থেকে টহলদার পুলিস শুনতে পেলে বিপদ ঘটবে।'

'বিপদ ঘটবে আপনার! আমার তাতে কি?'

আবার হাসল আবদুর রহিম ঠোঁট বাঁকা করে, বলল, 'না, বিপদ আপনারই ঘটবে। আমি ঠিকই পালাতে পারব। এবং আমি পালালে আপনার সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'তার মানে?'

'বলব, মানেটাও বলব। তার আগে দয়া করে আপনি আমার প্রস্তাবটা শুনুন।'

প্রফেসার রেহমান অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

'স্বনামধন্য সার্জেন আপনি, যিনি প্লাস্টিক সার্জারিতে স্পেশালিস্ট। আমার প্রস্তাব হলো, প্লাস্টিক সার্জারি করে আপনি আমার চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে দেবেন, বিনিময়ে আপনাকে আমি তিন লক্ষ টাকা দেব।'

'কী! এত বড় স্পর্ধা আপনার।' প্রফেসার রেহমান গর্জে উঠলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁচকা টানে খুলে ফেললেন ডেস্কের দেরাজ। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা ধরলেন। পিছন থেকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল তাঁকে আবদুর রহিম। অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ছিনিয়ে নিল প্রফেসারের হাত থেকে পিস্তলটা।

প্রফেসার হাঁপাতে শুরু করেছেন।

'আপনি কি রাজি নন আমার প্রস্তাবে?'

'না!'

আবদুর রহিম শান্তভাবে ফিরে এসে বসল চেয়ারটায়। পিস্তলটা রেখে দিল কোটের পকেটে। উঠে দাঁড়াবার সময় এনভেলপটা পড়ে গিয়েছিল, সেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ধরল প্রফেসারের দিকে।

'এটা খুলে পড়ুন। আপনার একমাত্র মেয়ে লুবনার চিঠি। আপনাকেই লেখা।'

'কি বললেন? লুবনার চিঠি? অসম্ভব, লুবনা কক্সবাজারে…।'

আবদুর রহিম অদ্ভুত রহস্যময় ভাবে হাসল, 'না। ফর ইওর ইনফরমেশন, মিস লুবনা এখন আমার হাতে বন্দিনী। চিঠিটা পড়ুন, সবই জানতে পারবেন।'

এনভেলপটা ছোঁ মেরে হাতে নিলেন প্রফেসার। খুললেন। হাত দুটো কাঁপছে তাঁর।

চিঠিটা ছোট। হাতের লেখা একটু বড় বড় কিন্তু এ লেখা যে লুবনারই, তাতে সন্দেহের কারণ দেখলেন না তিনি।

লুবনা লিখেছে,

> বাবা,
>
> কক্সবাজারে যাবার পথে, বেবী ট্যাক্সি করে আমি যখন বান্ধবীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছিলাম, একদল লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেবী ট্যাক্সি থামায়। লোকগুলো আমাকে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করে এই পোড়োবাড়িতে নিয়ে এসেছে। আবদুর রহিম সাহেব এই লোকগুলোকে নিযুক্ত করেছিলেন আমাকে কিডন্যাপ করার জন্যে। আবদুর রহিম সাহেব বলছেন, তুমি যদি ওঁকে সাহায্য করো, আমার কোন ক্ষতি করবেন না। তুমি সাহায্য না করলে এরা আমাকে এই পোড়োবাড়িতে খুন করবে।

বাবা, পুলিসে খবর দিয়ো না। রহিম সাহেব যা বলেন কোরো। আমাকে ফিরে পেতে হলে আর করার কিছু নেই। ইতি, তোমার স্নেহধন্যা, লুবনা।

চিঠি শেষ করে অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন প্রফেসার, 'লুবনা!'

চিঠি পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। বোকার মত তাকিয়ে রইলেন তিনি আবদুর রহিমের দিকে। আবদুর রহিমের ঠোঁটে ধূর্ত হাসি। প্রফেসার রেহমান দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে। আশ্চর্য শান্তভাবে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

প্রফেসার রেহমান আবদুর রহিমের জালিয়াতি বুঝতে পারেননি। চিঠিটা যে তাঁর মেয়ের হাতের লেখা নয় তা যদি তিনি বুঝতে পারতেন, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কখনোই আবদুর রহিমের চেহারা বদলে দিতেন না।

আবদুর রহিম প্রফেসার এবং তাঁর মেয়ে লুবনাকে অনেকদিন থেকেই চিনত। ব্যাঙ্কে ওদের দু'জনের অ্যাকাউন্ট আছে, সেই সূত্রে আবদুর রহিম ওদের সম্পর্কে সবই জানত। টাকা চুরি করার আগে সে ভেবেই রেখেছিল, প্রফেসারকে দিয়ে চেহারাটা পাল্টে ফেলতে হবে। প্রফেসার আদর্শবান পুরুষ, টাকার লোভে অন্যায় কাজ করতে রাজি হবেন না, একথাও তার জানা আছে। অনেকদিন থেকে ভাবনা-চিন্তা করছিল, কি উপায়ে প্রফেসারকে রাজি করানো যায়। এর মধ্যে একদিন লুবনা গেল ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে। আবদুর রহিম তাকে নিজের চেম্বারে বসিয়ে আপ্যায়ন করল। কথাবার্তার সময় লুবনা জানাল আগামী মাসের অমুক তারিখে সে কক্সবাজারে বেড়াতে যাবে। কথাটা শুনেই দুষ্টবুদ্ধিটা

খেলে গেল তার মাথায়। লুবনা এসেছিল ভার্সিটি থেকে। সাথে খাতাপত্র ছিল। কৌশলে লুবনাকে একবার ক্যাশিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দিল সে। লুবনা চেম্বার থেকে বেরিয়ে যেতেই, লুবনার একটা খাতা চুরি করে লুকিয়ে ফেলল ড্রয়ারে। এর খানিকপর লুবনা ফিরে এল, বিদায় জানিয়ে চলে গেল ব্যাঙ্ক থেকে।

আবদুর রহিম লুবনার খাতায় পেল লুবনার হাতের লেখা। খাতাটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লুবনার হাতের লেখা নকল করার কাজে অনুশীলন শুরু করল। মাসখানেকের মত সময় পেয়েছিল সে, এর মধ্যেই সাফল্য লাভ করল। হুবহু লুবনার হস্তাক্ষর রপ্ত করে ফেলল সে।

প্লাস্টিক সার্জারির ফল হলো আশ্চর্য ধরনের। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবদুর রহিমের ভয়ই লাগল প্রথমে। এ কোন্ লোক? একে তো সে চেনে না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে আনন্দে প্রায় নাচতে শুরু করল। যাক, মনে মনে ভাবল, আবদুর রহিম মরে গেছে, এখন থেকে আমি অন্য মানুষ, আমার অন্য নাম।

ঘা শুকাতে লাগল চার-পাঁচদিন। তারপর এক রাতে প্রফেসার বললেন, 'আমার কাজ আমি করেছি, এবার আপনার কথা আপনি রাখুন। ফিরিয়ে দিন আমার মেয়েকে। কাল সকালে আমি লুবনাকে দেখতে চাই।'

ল্যাবরেটরিতে কথা হচ্ছিল। আবদুর রহিম পোশাক পরল। তৈরি হলো বিদায় নেবার জন্যে।

পকেট থেকে প্রফেসারের পিস্তলটা বের করে বলল, 'এটা আপনার, রেখে দিন। আমি এখুনি রওনা হচ্ছি।'

পিস্তলটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন প্রফেসার, গর্জে উঠল সেটা

আবদুর রহিমের হাতে।

প্রফেসারের কপালের পাশে বিদ্ধ হলো বুলেট। রক্তাক্ত বিজ্ঞানী পড়ে গেলেন হুড়মুড় করে, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল সেই সাথে।

পিস্তলটা মৃতদেহের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ বের করে ডেস্কের উপর রাখল আবদুর রহিম। তারপর জানালা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। সিদ্দিক মিয়ার ঘুম ভাঙেনি পিস্তলের আওয়াজে। বিনাবাধায় আবদুর রহিম নেমে এল পাইপ বেয়ে নিচের রাস্তায়। অদৃশ্য হয়ে গেল সে রাতের অন্ধকারে।

সমাজে সে অন্য নামে, অন্য চেহারায়, অন্য পরিচয়ে বেঁচে থাকার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে, তার আর ভয় কি!

কিন্তু অপরাধ চাপা থাকে না, একথাটা জানত না আবদুর রহিম!

অভিজাত এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, কোন বাড়িতে কোনরকম বিপদ ঘটলে কেউ উপযাচক হয়ে এগিয়ে আসে না সাহায্যের জন্যে। গুলির শব্দ পাশের বাড়িগুলোয় পৌঁছলেও, কেউ দরজা-জানালাটি পর্যন্ত খুলল না। তবে, এক ভদ্রলোক বিবেকের তাড়নায় থানায় ফোন করে গুলির শব্দটার কথা জানিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন। অমনি ছুটে এল পুলিসের গাড়ি।

দশ মিনিটের মধ্যে জানা গেল, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসার রেহমান আত্মহত্যা করেছেন। এটা যে আত্মহত্যা নয়, খুন—একথা কেউ ভুলেও ভাবল না। প্রফেসারের ডেস্কের উপর একটা কাগজ পাওয়া গেছে। তাতে বাংলা অক্ষরে টাইপ করা আছে প্রফেসারের সর্বশেষ বক্তব্য।

প্রফেসার লিখেছেন:

আমি স্বেচ্ছায় সুইসাইড করছি। গবেষণায় উপর্যুপরি ব্যর্থতা, আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছে স্ত্রীর তিরোধান প্রত্যক্ষ করার দুঃখ, ভগ্ন স্বাস্থ্য—এইসব বিভিন্ন কারণে জীবনের প্রতি আর কোন মোহ নেই আমার, তাই যবনিকা টানলাম। ইতি, রেহমান খান খুশনবীশ।

তরুণ ইন্সপেক্টর হায়দার আলীর মনটা কোন কারণ ছাড়াই খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রফেসার রেহমানকে সে ব্যক্তিগত ভাবে চিনত না বটে কিন্তু তাঁর সম্পর্কে লোকমুখে এবং দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রের মাধ্যমে এত বেশি জেনেছে যে সে মেনে নিতে পারছে না এতবড় একটা প্রতিভা উল্লিখিত কারণে আত্মহত্যা করতে পারেন।

পরামর্শ এবং উপদেশের জন্যে সে খবর পাঠাল মি. সিম্পসনকে। মি. সিম্পসন দুঃসংবাদ শুনেই সশরীরে উপস্থিত হলেন অকুস্থলে।

ব্যস্তভাবে সব দেখলেন তিনি। চিন্তা করলেন। সবশেষে রায় দিলেন, 'সন্দেহের কিছু নেই। লাশ মর্গে পাঠিয়ে দিন। টেলিগ্রাম করুন মিস লুবনাকে। পিস্তলে প্রফেসারের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, তার মেশিনে টাইপ করা স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে—দরজা-জানালা সব ঠিক-ঠাক মত বন্ধ রয়েছে—আত্মহত্যা ছাড়া কি হতে পারে?'

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যুক্তি খণ্ডন করতে পারল না তরুণ ইন্সপেক্টর হায়দার আলী। লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করল সে।

কিন্তু শহীদকে অন্যরকম কথা বলল কুয়াশা।

কথা হচ্ছিল পরদিন শহীদের ড্রয়িংরুমে। মহুয়া তার দাদাকে দেখে কদমবুসি করে দ্রুত বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে, নাস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্যে। এই ফাঁকে কুয়াশা ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে

শহীদকে বলল, 'প্রফেসার রেহমান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তাঁকে যতটুকু চিনেছিলাম, আত্মহত্যা করার মত কাপুরুষতা তাঁর মধ্যে লক্ষ করিনি।'

'তিনি আত্মহত্যা করেনওনি। আমার বিশ্বাস, তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

শহীদ চিন্তিত মুখে কুয়াশার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'কোন প্রমাণ পেয়েছ নাকি?'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা, মেঝে এবং একদিকের দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড ছায়া পড়ল তার, 'সূত্রের সন্ধানে আছি। পেলে জানাব তোমাকে। তোমাকেই খুনীকে ধরার দায়িত্ব নিতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য করব আমি। জানোই তো, ক্যান্সার নিয়ে বড্ড ব্যস্ত আছি এখন। আচ্ছা, চলি। পিছনের দরজা দিয়ে যাব আমি। মহুয়া বুঝি কিচেনে গেছে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে, বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্ষান্ত করতে হবে ওকে।'

বলে শহীদকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আলখাল্লায় আবৃত কুয়াশা ড্রয়িংরুম থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিন

বিপদের কথা কেউ বলতে পারে না। আজহার মল্লিকের সুখের সংসার, হঠাৎ সেই সংসারে বিপদ তার কালো ছায়া ফেলবে তা কেউ জানত না।

প্রৌঢ় আজহার মল্লিক এক অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি করেন। আজ এগারো বছর এক নাগাড়ে চাকরি করছেন তিনি এই ধরনের ফার্মে। এখন যে ফার্মে চাকরি করছেন সেটি নতুন. মালিক বড় কড়া. তবে বেতন দেন ভাল। স্ত্রী এবং দুই যুবতী মেয়ে নিয়ে ছোট্ট সংসার তাঁর। মেয়ে দুটি ম্যাট্রিক পাস করে চাকরিতে ঢুকেছে। আজহার মল্লিক এ রকমটি চাননি, মেয়েরা জেদ করে চাকরি নিয়েছে। তবে মেয়েদেরকে তিনি খুব একটা বাধাও দেননি। মেয়েদের কাছ থেকে টাকা পয়সা তিনি কখনও নেন না, ওরা নিজেদের কাপড়-চোপড় কিনতে এবং শখ-সাধ মেটাতেই বেতনের টাকা খরচ করে ফেলে।

বড় মেয়ে আতিয়া খুব বুদ্ধিমতী এবং ধীর-স্থির প্রকৃতির। চাকরি করলেও, লেখাপড়াটা ছাড়েনি সে। অফিস থেকে ফিরে নিয়মিত পড়তে বসে। আগামী বছর প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার ইচ্ছে আছে তার।

ছোট মেয়ে তসলিমা বড় বোনের ঠিক বিপরীত। কারও শাসন সে মানে না। খুবই চঞ্চল স্বভাবের। দায়িত্বজ্ঞান একেবারে নেই বললেই চলে। পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে চাকরি করে, এবং অফিস ছুটির পর ক্লাবে রেস্তোরাঁয় ছেলে-বন্ধুদের সাথে হৈ-হৈ করে সময় কাটায়, গভীর রাত না করে বাড়ি ফেরে না সে।

সন্ধ্যার পর ওদের আম্মা মিসেস আজহার স্বামীর জন্যে মোজা বুনছিলেন শার্সি লাগানো জানালার সামনে মোড়ায় বসে। মাঝে মধ্যে জানালা দিয়ে বাড়ির বাগানের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছিলেন। জানালা থেকে গেটটা দেখা যায় না, কিন্তু গেট পেরিয়ে কেউ যদি বাড়িতে ঢুকতে চায় তাহলে তাকে বাগানের মাঝখানের সরু পথটা দিয়ে হেঁটে

আসতে হবে।

স্বামীর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মনে মনে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিনি। সকালে যাবার সময় বলে গেছেন, আজ টাকা কালেকশন করতে হবে, দেরি হতে পারে। কিন্তু তাই বলে এত দেরি! প্রায় সাতটা বাজে। এত দেরি তো কখনও হয় না।

এদিকে তসলিমারও দেখা নেই। অফিস থেকে একবার সে বাড়ি ফেরে কাপড়-চোপড় পাল্টাবার জন্যে, তারপর আবার বেরোয়। আজ এখনও সে ফিরছে না কেন বুঝতে পারছেন না তিনি।

এমন সময় গেট খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। কাঁটা ধরা হাত দুটো স্থির হয়ে গেল মিসেস আজহারের, মুখ তুলে তাকালেন বাগানের দিকে। দেখলেন, স্বামী বা ছোট মেয়ে নয়, পাশের বাড়ির ভাড়াটে জাহাঙ্গীর হোসেন বাগানের মাঝখান দিয়ে জানালার দিকে হেঁটে আসছে। মিসেস আজহার জানালার শার্সি খুললেন।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল জাহাঙ্গীর হোসেন। জিজ্ঞেস করল, 'খালা-আম্মা, কি করছেন?'

'এই তো বাবা, তোমার খালুর জন্যে মোজা বুনছি।'

জাহাঙ্গীর হোসেন বলল, 'খালা-আম্মা, তসলিমা আমার ওপর খেপে আছে। ওকে একটা ফ্রেঞ্চ সেন্ট উপহার দেব বলেছিলাম কিন্তু সেটা বাজারে খুঁজে পাইনি বলে দেয়া হয়নি। কথাই বলে না আজকাল দেখা হলে। এই বইটা ওরই, ওর হাতে যদি দেন…!'

'দাও, দেব'খন।' বলে জানালার ফাঁক দিয়ে বইটা নিলেন মিসেস আজহার।

জাহাঙ্গীর হোসেন চলে গেল। বইটা পড়ে রইল টেবিলে। একটু পর

আতিয়া বেরিয়ে এল তার কামরা থেকে, 'তসলিমা ফিরল না এখনও, না?'

মিসেস আজহার গম্ভীরভাবে বললেন, 'না। জাহাঙ্গীর এসেছিল। কি বলল জানিস? বলল, দেখা হলে নাকি কথাই বলে না তসলিমা। অমন ভাল ভদ্র একটা ছেলে, তাকে সে পাত্তাই দেয় না। গুণ্ডা-বদমাশদের সাথে মেলামেশা ওর…!'

আতিয়া কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে বইটা তুলে নিল, 'এটা এখানে কোত্থেকে এল?'

'গল্পের বই। ফিরিয়ে দিয়ে গেল জাহাঙ্গীর।'

বইটা খুলতেই একটা এনভেলপ দেখতে পেল আতিয়া। এনভেলপের উপর লেখা, 'তসলিমার জন্যে।'

আতিয়া চিঠিটা বইয়ের ভিতর রেখে বইটা হাতে নিয়েই নিজের কামরার দিকে পা বাড়াল, এমন সময় মিসেস আজহার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'ওই তোর বাবা আসছে। আতিয়া!'

মিসেস আজহার বড় মেয়ের নামটা এমন বিস্ময়ের সাথে উচ্চারণ করলেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আতিয়া, মায়ের দিকে ছুটে এল।

'কি হয়েছে, মা?'

'তোর বাবা অমন টলতে টলতে আসছে কেন, বল তো?'

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল আতিয়া। কিন্তু আজহার মল্লিককে তখন জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। একমুহূর্ত পর তিনি হলঘরে ঢুকলেন। মুখ তুলে তাকালেন, পরমুহূর্তে নিরতিশয় লজ্জা এবং সঙ্কোচে মাথা হেঁট করে নিলেন। টলতে টলতে হাঁটছিলেন তিনি, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'মা, তুমি তোমার কামরায় যাও তো।' আজহার মল্লিক জড়ানো গলায় বললেন বড় মেয়েকে। আতিয়া বোকার মত তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

'রেবা, এদিকে এসো, আমাকে উপরে নিয়ে চলো।' কথাটা বললেন আজহার মল্লিক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। মা এবং মেয়ে দেখল আজহার মল্লিকের চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। বেসামাল লাগছে তাঁকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছেন এদিক ওদিক। রেবা অর্থাৎ মিসেস আজহার দ্রুত পায়ে স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মদের গন্ধ ঢুকল তাঁর নাকে। স্বামীর একটা হাত ধরে ফেলে তিনি বললেন, 'তুমি—তুমি…!'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না মিসেস আজহার। আজহার মল্লিক তাঁকে থামিয়ে দিলেন হঠাৎ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

মিসেস আজহার অস্ফুটে বললেন, 'মেয়েরা বড় হয়েছে—এতদিন পর আবার তুমি…'

আতিয়া নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। পা বাড়াল সে নিজের কামরার দিকে।

'দাঁড়া, মা!' আজহার মল্লিক মেয়েকে বললেন।

আতিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এদিকে আয়! শোন…আমি লজ্জিত…এক লোক আমাকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছে…।'

কথা শেষ না করে আজহার মল্লিক টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন লম্বা সোফাটায়। হাতের চামড়ার ব্যাগটা পাশে রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি।

মিসেস আজহার স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস

করলেন, 'শরীর বুঝি খারাপ লাগছে?'

'না, আমি...ভালই আছি। চিন্তা কোরো না। ব্যাগটা তুলে রাখো, ওতে অনেক টাকা আছে।'

মিসেস আজহার বললেন, 'আজ কালেকশনের দিন, এমন একটা কাজ করা তোমার উচিত হয়নি। লোকটা কে শুনি?'

'তাকে তুমি চিনবে না। সব দোষ তার নয়। হয়েছে কি জানো, আজ দশ হাজার টাকা কালেকশন হয়েছে, এ থেকে টেন পার্সেন্ট কমিশন পাব আমি। বেতনের ওপর শতকরা দশ পার্সেন্ট কমিশন দেবে কোম্পানী, কথা হয়েছে আজ। মনটা ভাল ছিল। বাঁড়ি ফিরছিলাম, দেখা হলো পুরানো এক বন্ধুর সাথে। এক চাইনীজ রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সে। জোর করে নিয়ে গেল আমাকে রেস্তোরাঁয়। খাইয়ে দিল দু'তিন পেগ। যাক, কেউ যেন আর না শোনে এ-কথা, আর হবে না এমন।'

'টাকা সব ঠিকঠাক আছে তো?'

মিসেস আজহার ব্যাগটা তুলে খুলে ফেললেন। পরমুহূর্তে তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল ব্যাগটা মেঝেতে। ব্যাগের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল চার পাঁচটা পাথরের টুকরো।

'সর্বনাশ করে এসেছ! টাকা কোথায়? ব্যাগের ভিতর পাথর এল কোত্থেকে?'

'কি?' আজহার মল্লিক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন ব্যাগটা। সেটাকে চোখের সামনে তুলে ভিতরে তাকালেন, ভরে দিলেন ডান হাতটা। এক এক করে আরও চার-পাঁচটা পাথরের টুকরো বের করে মেঝেতে ফেললেন তিনি। তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এ কি! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! টাকা নেই কেন!'

নেশার ঘোর কেটে গেল আজহার মল্লিকের। কপালে করাঘাত করে বিলাপ করতে লাগলেন তিনি। আতিয়া পাশে এসে দাঁড়াল। বাবার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে পরীক্ষা করল সে।

তাজ্জব হয়ে বলল, 'বাবা, এ ব্যাগ তো তোমার না। এ তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'ব্যাগ আমার না? কি বলছিস তুই?'

আজহার মল্লিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না মেয়ের কথা শুনে।

'দেখতে একেবারে তোমারটার মতই, কিন্তু আমি বলছি এ ব্যাগ কক্ষনো তোমার হতে পারে না। তোমার ব্যাগের ভেতরের চেনটার কাছে ছিঁড়ে গিয়েছিল কাপড়, আমি নিজে সেলাই করে দিয়েছিলাম। দেখো এটা খুলে, সেলাইয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তাছাড়া তোমার ব্যাগটা পুরানো, এটা একেবারে নতুন কেনা।'

'তবে...তাহলে...আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, মা...।'

আতিয়া বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা করো, বাবা। কোথায় কোথায় গিয়েছিলে মনে করো। কারও সাথে ব্যাগ বদলাবদলি হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

হতাশায় মাথা দোলাতে দোলাতে আজহার মল্লিক বললেন, 'রেস্তোরাঁ ছাড়া আর কোথাও যাইনি, মা আমি। টাকা কালেকশন করতে দেরি হয়ে গেল, তাই ব্যাঙ্কে যাওয়া হলো না। বাড়ি ফিরে আসছিলাম, লোকটার সাথে তাদের রেস্তোরাঁর সামনে দেখা।'

'লোকটার সাথে তোমার কতদিনের পরিচয়?'

'অনেকদিন আগে, বছর দশেক তো হবেই, পরিচয় হয়। ওর সঙ্গে পড়ে আমি অসামাজিক হয়ে উঠেছিলাম। তোর মা যদি সে-সময় কড়া

না হত, সে-পথ এতদিনেও ছাড়তে পারতাম কিনা সন্দেহ। বছরখানেক দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ছাড়ল না কোনমতে। কিন্তু সে কেন আমার সাথে এমন শত্রুতা করবে? তাছাড়া সে জানবেই না কিভাবে আমার ব্যাগে টাকা আছে?'

'কথায় কথায় তাকে বলোনি তো?'

'না। কেন বলব?'

'কতক্ষণ ছিলে তুমি লোকটার সাথে?'

'পৌনে এক ঘণ্টার মত। আমাদের টেবিলে আর কেউ ছিলও না। ব্যাগটা আমি আমার পাশের চেয়ারে রেখেছিলাম সব সময়।'

মিসেস আজহার বললেন, 'ভুল করে ব্যাগটা অন্য কারও ব্যাগের সাথে বদলাবদলি হয়ে গেছে বলে মনে হয় না। এ কারও শত্রুতা। আর ভুল করে বদলাবদলি হয়ে থাকলেও, টাকা ফিরে পাবার আশা করা বৃথা। আজকালকার মানুষ কি আর আগের মত সৎ যে দশ হাজার টাকা পেয়েও ফিরিয়ে দেবে? তুমি আর দেরি না করে এখুনি থানায় গিয়ে ডাইরি করে এসো।'

আজহার মল্লিক ছল ছল চোখে বলল, 'তার আগে লোকটার সাথে একবার দেখা করে জিজ্ঞেস করলে হয় না?'

'আগে থানায় যাও, তারপর তার কাছে যেয়ো।'

আজহার মল্লিক পা বাড়ালেন। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'চাকরিটা তো গেলই, জেলও বুঝি খাটতে হবে এই বুড়ো বয়সে!'

'বাবা, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

মেয়ের কথা যেন শুনতেই পাননি, আচ্ছন্নের মত বেরিয়ে গেলেন আজহার মল্লিক হলঘরের দরজা দিয়ে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না আতিয়া। সময় দেয়াল ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা ঘোষণা করল।

'কি হবে এখন বল তো, আতিয়া?'

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মিসেস আজহার। আতিয়া শুকনো গলায় ব 'টাকা ফিরে পাওয়া যাবে সে আশা কোরো না, মা।'

'চাকরি গেলে…।'

আতিয়া বলে উঠল, 'তা না হয় গেল, কিন্তু বাবাকে দোষী করে যদি কেস করে কোম্পানী?'

মিসেস আজহার সোফায় হেলান দিলেন, 'আমার মাথা ঘুরছে।'

আতিয়া বলল, 'আটটা বেজে গেল, অথচ তসলিমার এখনও নেই।'

'ওর কথা আর বলিসনে আমাকে, যা ইচ্ছা করুক।'

দেখতে দেখতে রাত ন'টা বাজল। আজহার মল্লিক ক্লান্ত হয়ে ফি এলেন। বললেন, 'ডায়েরী তো করলাম কিন্তু টাকা ফিরে পাব আশা হচ্ছে না। লোকটাকেও সব কথা বললাম। সে তো আকাশ থে পড়ল। তার কাছেই গিয়েছিলাম আগে। যেচে পড়ে সে-ও গেল আ সাথে থানায়।'

'তাকে পুলিস জেরা করেনি?'

আজহার মল্লিক বিরক্তির সাথে বললেন, 'তার কি দোষ? আম অনেকদিন পর দেখে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে দু'পেগ খাইয়েছে— মানে কি এই যে টাকার লোভে ব্যাগটা সে-ই বদলে দিয়েছে?'

'পুলিসকে তুমি কি বললে?'

'বললাম তো সবই। কিন্তু…।'

মিসেস আজহার জানতে চাইলেন, 'তোমাকে জোর করে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে লোকটা সে কথা বলেছ পুলিসকে?'

'কি আশ্চর্য! জোর করে খাইয়েছে মানে কি? হাত পা বেঁধে গলায় ঢেলে দিয়েছে নাকি? অনেকদিন পর দেখা, একসাথে এককালে খেতাম, তাই...সম্মান দেখাবার জন্যেই সে আমাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়, খেতে বলে।'

এমন সময় তসলিমা এবং শামিম ঢুকল হলঘরে। শামিম দূর সম্পর্কীয় চাচাতো ভাই হয় তসলিমাদের। কালেভদ্রে আসে সে নারায়ণগঞ্জ থেকে। সুপুরুষ, মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করে, এখনও বিয়ে করেনি।

দু'বোনের মধ্যে তসলিমা সুন্দরী। সুন্দরী বলে তার বেশ অহঙ্কারও আছে। তার উপর এক শ্রেণীর যুবকের প্রশংসায় তসলিমার কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে, বাড়ির কাউকে বিশেষ ভয় করে না সে। বাবা এবং মা শাসন করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। আজকাল আর কিছু বলেন না। মেয়ে রোজগার করে, জোর করে তাকে কিছু বলতে গেলে হয়তো বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে যাবে।

কিন্তু আতিয়া এখনও হাল ছাড়েনি। প্রয়োজনে সে ছোট বোনকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করতে ছাড়ে না।

'এত দেরি করলি যে?'

আতিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিল না তসলিমা, সে টেবিলের উপর বই। দেখে পা বাড়াল সেদিকে। উত্তর দিল শামিম। 'ও আমার সাথে ছিল।'

ঘাড় ফিরিয়ে আতিয়া তাকাল তীব্র দৃষ্টিতে শামিমের দিকে। শামিম একটু ইতস্তত করে বলল, 'ক্লাবে হাউজী খেলছিল, সেখানে দেখা ওর সাথে।'

ইতোমধ্যে বইটা তুলে নিয়ে ভিতর থেকে এনভেলপটা বের করে ফেলেছে তসলিমা। কাঁধের শাড়ি খসে পড়েছে, ব্লাউজ দেখা যাচ্ছে, খেয়াল নেই সেদিকে। খেয়াল নেই বাবার বিমর্ষ চেহারার দিকেও, গালে হাত দিয়ে মা গভীর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন, সেদিকেও চোখ পড়ল না তার। এনভেলপ খুলে সে চিঠি পড়তে ব্যস্ত।

চিঠিটা পড়া শেষ করে দু'হাত দিয়ে ধরে দু'টুকরো করে মেঝেতে ফেলে দিল সেটা তসলিমা, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল, বলল, 'আমি কাপড় বদলাতে যাচ্ছি, এক বান্ধবীর জন্মদিনের ডিনার আছে, যেতে হবে আমাকে…।'

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। শামিম ছেঁড়া চিঠিটা মেঝে থেকে তুলে নিচ্ছে, দেখতে পেয়েছে সে। দু'পা এগিয়ে শামিমের হাত থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। বলল, 'অন্যের চিঠি পড়তে নেই, জানো না, নাকি?'

বলে টুকরো দুটো ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে রাখল তসলিমা। তারপর সিঁড়ির দিকে এগোল।

'দাঁড়া! আজ তোর আর বাইরে যাওয়া হবে না।'

দাঁড়াল তসলিমা, পিছন দিকে না তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কেন?'

আতিয়া বলল, 'একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বাবা দশ হাজার টাকা হারিয়ে এসেছেন। কেউ ঠকিয়ে বাবার টাকাভর্তি ব্যাগটা নিয়ে একই রকম অন্য একটা ব্যাগ গছিয়ে দিয়েছে। চাকরিটা তো যাবেই, জেলও না খাটতে হয়!'

ঘুরে দাঁড়াল তসলিমা।

আজহার মল্লিক এক কোণ থেকে বললেন, 'অফিসে গিয়ে কি করে

যে খবরটা বলব, ভেবে পাচ্ছি না। অবশ্য মাস কয়েক সময় পেলে টাকাটা দিতে পারা যাবে…।'

তসলিমা সম্পূর্ণ ঘটনাটা শুনল। শামিমও প্রশ্ন করে জেনে নিল খুঁটিনাটি। এমন একটা দুঃসংবাদ, শামিম খুবই দুঃখ প্রকাশ করল। সাড়ে ন'টার সময় বিদায় চাইল সে। বলল, 'মান্থলি টিকেট রয়েছে যখন, বাস ভাড়া দিয়ে লাভ কি। এর পরে গেলে লাস্ট ট্রেন ধরতে পারব না।'

আজহার মল্লিক বললেন, 'রাতটা না হয় থেকেই যাও। প্রচণ্ড শীত পড়েছে, সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা ঢেকে ফেলেছে চারদিক।'

'না কাকা, সকালে আবার অফিসে যেতে হবে। আমি যাই।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল শামিম।

তসলিমা কিছু বলবে, তার দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আতিয়া সন্দেহ করল। বলল, 'কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা, মুখ হাত ধুয়ে আয়, খেতে হবে না?'

'কিন্তু, দিদি…।'

আতিয়া কঠিন স্বরে বলল, 'কি?'

'বান্ধবীকে যে কথা দিয়েছি…!'

আতিয়া ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কথা দিলেই যে কথা রাখতে হবে তার কি মানে আছে? বাড়িতে এরকম বিপদ, সব জেনেও তুই যাবি ফুর্তি করতে?'

তসলিমা জবাবে বলল, 'আমি না গেলে কি বাবার বিপদটা কেটে যাবে?'

'বিপদ বাবার, না?'

তসলিমা বিরক্তির সাথে বলল, 'না হয় আমাদের সকলেরই, আমি

বাড়িতে থাকলে কি উদ্ধার পাব সকলে…?'

'বান্ধবীর জন্মদিন বলে, না কোন বখাটে ছেলের সাথে ক্লাবে যাবার কথা আছে…?'

তসলিমা চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে, 'যাব না। হলো তো!'

আতিয়া চুপ করে রইল। তসলিমা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল নিজের কামরায়।

দশটার সময় নিচের ডাইনিংরুমে খেতে বসল সবাই। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে একে একে উঠে এসে বসল হলঘরে। মায়ের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে আতিয়া একটা প্রশ্ন করল তসলিমাকে।

'সেদিন তোকে যে ভদ্রলোক গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তিনি কি করেন?'

তসলিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'এমদাদের কথা বলছ তুমি? এমদাদুল হক। অগাধ টাকার মানুষ ও।'

'তা একদিন বাড়িতে ডেকে আনলেই তো পারিস।'

তসলিমা তাচ্ছিল্যভরে বলল, 'আমাদের যা নোংরা বাড়ি। কোন ভদ্রলোক যদি দেখে এই রকম বাড়িতে আমি থাকি…।'

আতিয়া রেগে গেল, 'টাকা দিয়ে মানুষের পরিচয় হয়? '

'আজকাল টাকা দিয়েই হয়।'

মুখের উপর জবাব দিয়ে বসে রইল তসলিমা। খানিকপর কাউকে কিছু না বলে উঠে গেল সে উপরে। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মিসেস আজহার, 'শামিম ছেলেটা এই কুয়াশায় ঠিক মত স্টেশনে পৌঁছুল কিনা! ফারুকও আজ বড় দেরি করছে ফিরতে।'

ফারুক শিক্ষিত যুবক। আতিয়াকে পড়ায় সে। কিছুদিন তসলিমাকেও পড়িয়েছিল। কিন্তু তসলিমার পড়াশোনায় মন নেই, তাই সে পড়ায় না। দোতলার সর্ব-দক্ষিণের কামরায় কিছুদিন থেকে থাকছে ফারুক। সংলগ্ন বাথরুম আছে তার কামরার সাথে। সিঁড়িটাও আলাদা। সে থাকাতে এ বাড়ির কারও কোন অসুবিধা হয় না। ইতোমধ্যেই সে পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। স্বভাব-চরিত্র ভাল বলেই মনে হয়। কি এক মেশিনারী ফার্মে চাকরি করে। বেতন ভালই পায়। এ বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু খায়দায় বাইরে।

মিসেস আজহারের বড় প্রিয় পাত্র এই ফারুক। তিনি মনে মনে আশা পোষণ করেন, ফারুককে জামাই করবেন।

মেয়েরা বড় হলে মায়ের মন এরকম অনেক কল্পনাই করে। ফারুককে জামাই করার ব্যাপারটাও তাঁর সেইরকম একটা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার। তাদের কেউ ফারুককে বিয়ে করতে রাজি হবে কিনা তা তিনি ভেবে দেখেননি। তাছাড়া, ফারুকও যে রাজি না হতে পারে সে কথাও তিনি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করেননি। ফারুক খুব চাপা স্বভাবের ছেলে। নিজের কথা কোনদিন সে এ-বাড়ির কাউকে গল্পচ্ছলে বা অন্য কোন প্রসঙ্গেও জানতে দেয়নি আজ পর্যন্ত। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু কেউই জানে না। সকালে বেরিয়ে যায় সে, ফেরে রাত আটটা ন'টায়।

দশটার দিকে হলঘরের দরজার কড়া নড়ে উঠতে আতিয়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। ফারুক এবং তার পিছু পিছু শামিম ঢুকল ভিতরে।

ফারুক বলল, 'বাইরে সাংঘাতিক কুয়াশা! একহাত দূরের জিনিসও

দেখা যাচ্ছে না।'

আতিয়া সপ্রশ্ন চোখে শামিমের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'ফিরে এলে যে?'

'ফিরে না এসে উপায় আছে? কুয়াশায় পথ চেনা অসম্ভব। রিকশা-টিকশাও পেলাম না। দিক হারিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছিলাম কে জানে, হঠাৎ ধাক্কা খেলাম ফারুক সাহেবের সাথে। উনিই তো নিয়ে এলেন সাথে করে।'

মিসেস আজহার বললেন, 'ভালই করেছ, ফিরে এসেছ।'

এই সময় রুমাল বের করতে গিয়ে শামিমের পকেট থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট পড়ে গেল মেঝেতে।

ফারুক হাসতে হাসতে বলল, 'এত টাকা! এত টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করা কি ভাল?'

শামিম উত্তরে বলল, 'কত আর! মাত্র আট হাজার। যেভাবে এসেছে সেভাবেই খরচা হয়ে যাবে।'

'যেভাবে এসেছে মানে? ব্যাঙ্ক লুট করে পেয়েছেন নাকি?'

অপ্রতিভ দেখাল শামিমকে। বলল, 'না...মানে, হাউজী খেলে পেয়েছি।'

আরও কিছু টুকরো আলাপের পর ফারুক সিঁড়ি দিয়ে চলে গেল নিজের কামরায়। মিসেস আজহারও আতিয়াকে সাথে নিয়ে উঠে গেলেন উপরে।

সুযোগ পেয়ে আজহার মল্লিক কথাটা পাড়লেন, 'শামিম, তোমার কাছে অত টাকা থাকলে আজেবাজে খরচা হবে। তুমি বরং টাকাগুলো আমার কাছে রেখে দাও। শুনেছই তো কি রকম বিপদে পড়ে গেছি

হঠাৎ। তোমার টাকাটা পেলে, কোম্পানীকে দিয়ে এ যাত্রা চাকরিটা বাঁচানো যায়। মাস কয়েক পরে আবার তুমি চাইলেই আমি দিয়ে দেব…।'

শামিম বলল, 'কিন্তু কাকা, যে জমিটা বায়না করে রেখেছি সেটা আগামী হপ্তার মধ্যে রেজিস্ট্রি করে না নিলে যে বায়নার পাঁচ হাজার টাকা পানিতে যাবে!'

'ওহ্! তুমি জমি কেনার জন্যে বায়না করে রেখেছ তা তো জানতাম না।'

শামিম বলল, 'কাউকে বলিনি। ভেবেছিলাম রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে বলব।'

আজহার মল্লিক বললেন, 'তবে থাক।' বলে তিনি উঠে গেলেন উপরে।

শামিম নিচের এই হলঘরেই সোফার উপর শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে, ঠিক হয়েছে আগেই। আতিয়া কম্বল এবং বালিশও দিয়ে গেছে তার জন্যে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে সোফার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল শামিম। মাথাটা পর্যন্ত ঢুকিয়ে নিল কম্বলের ভিতর।

রাত বাড়ল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল বাড়ি। উপরতলা থেকে আর কোন শব্দ আসছে না। ধীরে ধীরে কম্বল সরিয়ে সোফার উপর উঠে বসল শামিম। কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই। জেগে নেই কেউ, বুঝতে পারল সে। সোফা ছেড়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগোল। সিঁড়ি টপকে করিডর ধরে তসলিমার কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর দরজার গায়ে হাত দিয়ে একটু চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা।

দরজা বন্ধ, ভেবেছিল শামিম। খোলা রয়েছে দেখে বেশ একটু অবাকই হলো সে।

কামরার ভিতর অন্ধকার। খাটটা দেখা যাচ্ছে। সাদা মশারী টাঙানো রয়েছে খাটের উপর, অস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকার কামরার ভিতর ঢুকল শামিম। ঢুকে ভিতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

চার

গভীর রাত। তন্দ্রা মত এসেছিল মিসেস আজহারের, হঠাৎ কি একটা প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠলেন তিনি। বেডসুইচ জ্বেলে দেখলেন, স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন মেঝেতে।

'কিসের শব্দ হলো গো?'

আজহার মল্লিক চিন্তিত ভাবে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারিনি!'

'দরজা-জানালা বন্ধ করার আওয়াজ তো অত জোরে হবে না! দরজা খোলো, নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে বাড়িতে।'

আজহার মল্লিক বললেন, 'দূর। ইঁদুর-টিদুর হবে বোধহয়। তবু দেখা দরকার।'

দরজা খুলে করিডরে বেরোলেন তিনি। প্রথমেই চোখে পড়ল, তসলিমার কামরার দরজা খোলা।

ভুরু কুঁচকে এগোলেন তিনি। সিঁড়ির মাথায় একটা বালব জ্বলছে, তার আলোয় কামরার ভিতরটা দেখলেন তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

বড়সড় কি একটা লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে কামরার ভিতর, ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না অল্প আলোয়।

'তসলিমা! তসলিমা ঘুমোচ্ছিস নাকি?'

বেশ কয়েকবার ডাকলেন তিনি, কিন্তু তসলিমার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মেয়ের কামরায় ঢুকলেন তিনি। বোতাম টিপে আলো জ্বাললেন। দেয়ালের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে মাথা ঘুরে গেল তাঁর, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

করিডর থেকে আতিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হলো কি?'

আজহার মল্লিক তখনও সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছেন শামিমের মৃতদেহের দিকে। উপুড় হয়ে কার্পেটের উপর পড়ে আছে শামিম। তার পিঠে লম্বা একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ। শামিম যে মরে গেছে দেহের স্থিরতা দেখেই বুঝতে পারলেন তিনি।

আতিয়ার গলা শোনা গেল আবার, 'বাবা?'

'সাংঘাতিক ব্যাপার! এখানে এসো না কেউ তোমরা। শামিম...শামিম...খুন হয়েছে শামিম! হায় আল্লা, এ কি বিপদ হলো আমার! আতিয়া, ফারুক কোথায়?'

করিডরের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত থেকে ফারুক বলল, 'আসব, খালু?'

ফারুক প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। তসলিমার কামরায় ঢুকে আঁতকে উঠল সে, 'সর্বনাশ!'

পরমুহূর্তে ফারুকের দৃষ্টি পড়ল তসলিমার খাটের উপর। মশারীর ভিতর লেপ গায়ে জড়িয়ে কে যেন শুয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল ফারুকের। লাফ দিয়ে খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দু'হাত দিয়ে মশারীর ঝুলন্ত পর্দা চালের উপর তুলে দিল। তারপর

লেপটা ধরে সবেগে মারল এক টান।

দেখা গেল লেপের নিচে তসলিমা নেই। তসলিমার জায়গায় লম্বা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে একটা কোল বালিশকে।

গম্ভীর মুখে ফারুক বলল, 'সেই পুরানো কৌশল।'

আজহার মল্লিক বললেন, 'তসলিমা গেল কোথায়?'

ফারুক চিন্তিতভাবে বলল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' কথাটা বলে শামিমের নিঃসাড় দেহের কাছে গিয়ে বসল ফারুক। একটা হাত তুলে নিয়ে পালস দেখল। নিরাশ ভাবে এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। ছেড়ে দিল আস্তে করে হাতটা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছোরাটা দেখছি আপনারই?'

'হারিয়ে ফেলেছিলাম ওটা। অনেক খুঁজেও পাইনি।' কথাটা বলে আজহার মল্লিক ঝুঁকে পড়লেন মৃতদেহের দিকে, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন ছোরাটা।

প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ফারুক তাঁকে, বলল, 'করেন কি, খালু! ওই ছোরাতে খুনীর হাতের ছাপ থাকতে পারে, ওতে হাত দেয়া মোটেই উচিত হবে না।'

'ওর পকেটে টাকা ছিল, দেখা দরকার আছে কিনা?'

ফারুক বলল, 'তা দেখতে পারেন।'

মৃতদেহের সামনে বসে প্যান্ট এবং শার্টের পকেট হাতড়ালেন আজহার মল্লিক। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'নেই!'

ফারুকের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, সরাসরি তাকিয়ে রইল সে আজহার মল্লিকের দিকে। বলল, 'ওই টাকার জন্যেই শামিম সাহেব খুন হয়েছে। যে-কেউ এই সন্দেহ করবে।'

আজহার মল্লিক কাঁপছেন। বললেন, 'তোমার খালা-আম্মা এবং আমি, আমরা দু'জনেই প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনেছি। জানালা-দরজা ভাঙার শব্দ কিনা বলতে পারব না। দেখা দরকার…।'

সবাই মিলে জানালা দরজা পরীক্ষা করল। সব ঠিক আছে, কোনটাই ভাঙা হয়নি। শুধু হলঘরের একটা জানালার শার্সি খোলা, ভেজানো অবস্থায় দেখা গেল।

তসলিমার কামরায় মৃতদেহের কাছে ফিরে এল আবার সবাই। আতিয়াও ঢুকল কামরায়। ফারুক বলল, 'দরজা-জানালা ভাঙা হয়নি। সুতরাং শব্দের কথা পুলিস বিশ্বাসই করবে না। হলঘরের জানালার শার্সি খোলা রয়েছে বটে, কিন্তু পুলিস বলবে ওটা আপনারাই খুলেছেন বোকা বানাবার জন্যে। তাছাড়া, শার্সি খুললে অত জোরে শব্দ হয় না। শামিম সাহেবের কাছে টাকা ছিল। সে তো খুন হয়েছেই, তার পকেটের টাকাও সেই সাথে গায়েব হয়ে গেছে। পুলিস প্রথমেই সন্দেহ করবে এ বাড়িরই কেউ টাকার লোভে শামিম সাহেবকে খুন করেছে।'

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তসলিমার খাটের উপর বসে পড়লেন আজহার মল্লিক। বললেন, 'তবে কি পুলিস আমাকেই সন্দেহ করবে?'

ফারুক বলল, 'তার ওপর পুলিস জানে, আপনার দশ হাজার টাকা খোয়া গেছে। সন্দেহ নয়, তারা ধরেই নেবে আপনি ছাড়া এ অপরাধ আর কেউ করতে পারে না। এদিকে তসলিমার কামরায় তসলিমাও নেই—কে জানে তার ভাগ্যে কি ঘটেছে!'

আজহার মল্লিক কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন, 'আমি এখন কি করব, বলো!'

'পুলিসে খবর দিন।' কিন্তু পরমুহূর্তে ফারুক আবার বলল, 'কিন্তু তা কি উচিত হবে?'

'উচিত হবে মানে?'

মিসেস আজহার দরজার আড়াল থেকে এতক্ষণ সকলের কথা-বার্তা শুনছিলেন, এবার তিনি কামরার ভিতর ঢুকলেন, 'না, উচিত হবে না। পুলিসকে না জানিয়ে যা করার করতে হবে। পুলিসকে খবর দেয়া মানে···অসম্ভব! ধ্বংস হয়ে যাব আমরা সবাই! তসলিমার কামরায় শামিমের লাশ, পুলিস তসলিমাকেই আগে বেঁধে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে সবকিছুর আগে লাশটাকে হলঘরে নামিয়ে নিয়ে যাই?' প্রস্তাব দিলেন আজহার মল্লিক।

ফারুক বলল, 'সেটাও উচিত হবে বলে মনে করি না আমি। পুলিসের চোখে ধুলো দেয়া অত সহজ নয়। আমরা এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যাই করি না কেন, কোথাও না কোথাও ভুল থাকবেই।'

মিসেস আজহার ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'এ কি হলো আল্লাহ! টাকা চুরি গেল, তার ওপর এই ভয়ঙ্কর বিপদ!'

ফারুক বলল, 'টাকা চুরির সাথে এই খুনের একটা সম্পর্ক পুলিস পরিষ্কার দেখতে পাবে।'

আতিয়া একটু বিরক্তির সাথে বলল, 'বারবার আপনি ওই একটা কথা বলবেন না। আপনি যা সন্দেহ করছেন তা সত্যি নয়। আমরা কেউ টাকার লোভে শামিমকে খুন করিনি।'

ফারুক বলল, 'তুমি খামোকা আমার ওপর চটছ। আমি আমার কথা বলিনি। পুলিস কি ভাববে, কোন্ দৃষ্টিতে ঘটনাটাকে দেখবে তাই বলার

চেষ্টা করছি।'

আজহার মল্লিক বললেন, 'চক্রবর্তী লেনে ঢি ঢি পড়ে যাবে। আর কাউকে মুখ দেখাতে হবে না। কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিস যখন সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে···উহ্! তার চেয়ে এসো সবাই মিলে বিষ খেয়ে মরি।'

মিসেস আজহারও কান্নায় ভেঙে পড়লেন এই সময়।

আতিয়া ধমক দিয়ে বলল, 'আহ্! মা তুমি শান্ত হও। ফারুক সাহেব, আপনার এত মাথা ব্যথা কেন বলুন তো? পুলিস কি সন্দেহ করবে না করবে তা আপনি জানলেন কিভাবে আগে ভাগে? পুলিস যাই সন্দেহ করুক, একজন নিরপরাধ লোককে বিচারক শাস্তি দিতে পারেন না। কই, একথাটা তো একবারও বললেন না?'

ফারুক বলল, 'বিচারক বিচার করবেন কিসের ভিত্তিতে? তাঁকে বাস্তব ঘটনা, ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি জানাবেন, তিনি সে-সবের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে রায় দেবেন। বাস্তব ঘটনা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পূর্ণ আমাদের প্রতিকূলে, দুর্ভাগ্যক্রমে। বিচারকের রায় আমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। আর নিরপরাধ লোকের শাস্তির কথা যদি বলেন, পৃথিবীতে ভুরি ভুরি ঘটেছে অমন, নিরপরাধ লোক জেল খেটেছে সারাজীবন, এমন কি ফাঁসিও হয়ে গেছে বহু লোকের।'

আতিয়া অন্যদিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল। খানিকপর সে বলল, 'একটা বিপদে পড়েছি আমরা, উনি কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিতে শুরু করলেন।'

ফারুক বলল, 'এ ভারি আশ্চর্য কথা! তুমি অকারণে আমার ওপর এমন খেপে উঠলে কেন বুঝতে পারছি না।'

আতিয়া খানিকটা সামলে নিল নিজেকে। তার কণ্ঠস্বরে রাগের

চেয়ে অভিমানের মাত্রা বেশি ফুটল, 'বিপদটা কত বড় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। বিপদ থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি, সেটাই ভাবনা চিন্তার বিষয় হওয়া দরকার।'

ফারুক বলল, 'আমিও তো তাই বলতে চাইছিলাম।'

আজহার সাহেব বললেন, 'একটা উপায় বের করো না, বাবা…।'

ফারুক খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'বাইরে গাঢ় কুয়াশা। লোকজন নেই রাস্তায়। লাশটা আমরা এই পাড়ার শেষে যে মাঠ রয়েছে সেখানে ফেলে দিয়ে আসতে পারি। কাজটায় অসম্ভব ঝুঁকি আছে, ধরা পড়ে গেলে কেউ বাঁচব না। তবু এ ছাড়া আর কোন উপায়ের কথা তো আমার মাথায় আসছে না।'

আতিয়া বলল, 'কেবল আপনার মুখ থেকেই এরকম একটা উপায়ের কথা আশা করা যায়। ভীষণ দুঃসাহসী আপনি, বোঝা গেল।'

'আমার সমালোচনা পরে কোরো, আতিয়া। এ বাড়ির লোকদের ওপর পুলিস যাতে সন্দেহের চোখে না তাকায় সে-রকম একটা উপায় আবিষ্কার করতে চাইছি আমি। পুলিসকে জানানো হবে, শামিম সাহেব এ বাড়িতে এসেছিলেন, কিন্তু আবার চলে যান তিনি। ফেরার পথে খুন হয়েছেন।'

'আমি রাজি নই। কাজটা অন্যায় হবে।'

ফারুক রেগেমেগে বলল, 'তা ঠিক! তাহলে পুলিস ডাকো। সব কথা যা সত্যি গড়গড় করে বলে দাও।'

'মা, তুই চুপ করে থাক তো! ফারুক যা বলছে, আমারও সায় আছে তাতে। ওই একটাই উপায়, এই উপায়েই আমরা বাঁচার চেষ্টা করতে পারি।'

বাবার কথার উপর আর কোন কথা বলল না আতিয়া।

ফারুক বলল, 'সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

আজহার মল্লিক স্ত্রীকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওদের পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই আতিয়া চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কেন খুন করলেন শামিমকে?'

সামনে ফণা তোলা কেউটে দেখলে মানুষ যেমন লাফিয়ে ওঠে, ফারুকও তেমনি লাফিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ? কি বললে? আমি? আমি শামিম সাহেবকে···? আতিয়া, তোমার কি মাথার ঠিক নেই? ছোরাটা তোমার বাবার, আর তুমি বলছ আমি···।'

'ছোরাটা চুরি করা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।'

'মোটিভ কি? শামিম সাহেবের টাকার ওপর আমার লোভ হবে কেন? টাকার তো কোন অভাব নেই আমার। ওকে আমি ভাল করে চিনিও না, ঈর্ষাও মোটিভ হতে পারে না।'

আতিয়া বলল, 'মোটিভ আবিষ্কারের দায়িত্ব আমার নয়। আমি ভাবছি, লাশটাকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে এত আগ্রহ কেন আপনার।'

'সহজ জবাব আছে এর। আমিও তো এ বাড়িতে বাস করি। পুলিস এ বাড়িতে লাশ পেলে সকলের সাথে আমাকেও সন্দেহ করবে।'

আতিয়া চাপা কণ্ঠে বলল, 'আপনি চমৎকার কৌশলে বাবাকে এবং মাকে নিজের প্রস্তাবে রাজি করালেন—এ আমি ভুলব না, মনে রাখবেন।'

কথা ক'টা বলে আতিয়া বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। একটা অয়েল ক্লথের উপর রাখা হলো প্রথমে মৃতদেহ, তারপর পরানো হলো তাকে কোট। পায়ে

মোজাসহ জুতোও পরিয়ে দেয়া হলো। ফারুকের পরামর্শে আজহার মল্লিক ওভারকোট গায়ে দিলেন, মাথা এবং মুখের অধিকাংশ ঢাকলেন মাফলার দিয়ে, যাতে দেখলেই কেউ যেন চিনতে না পারে। ফারুকও ওভারকোট এবং মাফলার দিয়ে ঢেকে নিল নিজেকে। তারপর ধরাধরি করে নামানো হলো লাশ নিচে।

হলঘর এবং বাইরের আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। ফারুক বাগানের মাঝখান দিয়ে গেট পর্যন্ত গেল, ফিরে এসে বলল, 'এবার আমরা রওনা হতে পারি।'

গেট পর্যন্ত ধরাধরি করে লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। লাশ নামিয়ে গেট খুলল ফারুক অতি সন্তর্পণে। রাস্তার এদিক ওদিক দেখাই যায় না গাঢ় কুয়াশায়। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পরও কোন মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

সাড়া-শব্দ পাওয়া না গেলেও বাড়ির অদূরে দাঁড়ানো লাইটপোস্টের আড়ালে একটা ছায়ামূর্তি হাজির আছে গত ক'ঘণ্টা ধরে। কিন্তু সে খবর এদের জানার কথা নয়।

ছায়ামূর্তি অবশ্য গেট খোলার এবং আনুষঙ্গিক কিছু শব্দ ঠিকই শুনতে পেল।

রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা লাশ নিয়ে। শ'তিনেক গজ দূরে মাঠটা। সেই মাঠে যাবার পথে ওরা কোন আকস্মিক বিপদের মুখোমুখি হলো না। মাঠের এক ধারে মৃতদেহ ফেলে দিয়ে ওরা নিরাপদেই ফিরে এল।

গেট দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে ফারুক পকেট থেকে ছোরা বের করে বলল, 'খালু, এটা রাখুন। লাশের পিঠ থেকে বের করে নিয়েছি। এ

ছোরা যদি পুলিস দেখত লাশের পিঠে…! আপনার কাছেই রাখুন।'

ছোরাটা নিয়ে আজহার মল্লিক স্বস্তির দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'যাক, বাঁচা গেল! এখন প্রশ্ন হলো, তসলিমা গেল কোথায়?'

সেই সময় শোনা গেল সদর গেট খোলার শব্দ।

'ওই যেন কে আসছে!'

খানিকপর হলঘরে ঢুকল তসলিমা। তার কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো সবাই। শাড়ি ছিঁড়ে গেছে বেশ ক'জায়গায়। হাতে সাদা দাগ, সম্ভবত হোয়াইট ওয়াশের।

'আতিয়া তোমাকে আজ রাতে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিল। তবু কেন গেলে?' প্রশ্ন করলেন আজহার মল্লিক।

তসলিমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

'শাড়ি ছেঁড়া কেন?' জানতে চাইলেন মিসেস আজহার।

নিচু গলায় জবাব দিল তসলিমা, 'প্রিন্স অ্যান্ড প্রিন্সেস ক্লাবে ছিলাম, পুলিস হানা দিয়েছিল ওখানে, জানালা গলে পালাতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

'ওই ক্লাবে কেন গিয়েছিলে? কোন ভদ্রলোকের মেয়ে ওখানে যায়? শুনেছি গুণ্ডা বদমাশদের আড্ডা ওটা।'

তসলিমা উত্তর দিল না।

'কার সাথে গিয়েছিলি?'

'এমদাদের সাথে।'

আজহার মল্লিক বললেন, 'কেমন লোক সে? একটা যুবতী মেয়েকে নিয়ে সে ওখানে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত থাকে কি করে?'

মিসেস আজহার জানতে চাইলেন, 'ফিরলে কিভাবে?'

'বাইরে এমদাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা নিয়ে চলে এসেছি আমি। গাড়িটাকে ওই ফাঁকা মাঠে রেখে এইটুকু হেঁটে এসেছি। আমার মাথা ঘুরছে, শুতে যাচ্ছি।'

পা বাড়াল তসলিমা সিঁড়ির দিকে।

'দাঁড়া!' আতিয়া কঠিন সুরে বলল।

দাঁড়িয়ে পড়ল তসলিমা।

'শামিম তোর কামরায় গিয়েছিল কেন?'

তসলিমা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কি?'

'যায়নি বলতে চাস?'

তসলিমা হঠাৎ একটু হাসল, বলল, 'নাটক থাক না! যা বলবার খুলে বল। শামিম আমার কামরায় যায়নি···কিন্তু কোথায় সে? তাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারো! সে যখন এখানে তোমাদের সাথে গল্প করছে, আমি তখন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই।'

'ক'টা বেজেছিল তখন?'

'এগারোটা, সাড়ে এগারোটা। কিন্তু এত প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন আমাকে?'

তসলিমার প্রশ্নের উত্তরে কেউ কিছু বলতে পারল না।

সবাইকে ইতস্তত করতে দেখে এতক্ষণে ফারুক কথা বলল, 'শামিম সাহেবকে তোমার কামরায় নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তসলিমা।'

'কি? না···!' পড়ে যাচ্ছিল তসলিমা, কোন মতে তাল সামলে বসে পড়ল একটা চেয়ারে, 'আমার কামরায়···শামিম মরে গেছে!'

ফারুক বলল, 'হ্যাঁ। প্রশ্ন হলো, কেন তিনি তোমার কামরায়

ঢুকেছিলেন?'

'জানি না তো! কিন্তু···আপনারা এ কি বলছেন? সত্যিই কি শামিম···?'

'হ্যাঁ।'

তসলিমা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ফারুকের দিকে। ফারুক বলল, 'চিন্তা কোরো না। পুলিস যাতে হত্যাকাণ্ডের সাথে এ বাড়ির কাউকে জড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ব্যাখ্যা করে সব জানানো হলো তসলিমাকে।

ফারুক বলল, 'চলো, তোমার কামরা থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা দেখবে চলো।'

রাজি হলো না তসলিমা। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। কামরার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে দেখল সে। কিছুই চুরি যায়নি, বলল। কিন্তু তার হ্যান্ডব্যাগে পাশের বাড়ির জাহাঙ্গীর হোসেনের লেখা যে চিঠিটা ছিল সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।

টেবিলে খোলা অবস্থায় হ্যান্ডব্যাগটা দেখে বলল, 'এটা এখানে ছিলই না। ছিল ওই হুকে ঝোলানো।'

ফারুক বলল, 'ভুল করে অন্য কোথাও রেখেছ হয়তো চিঠিটা। ছেঁড়া একটা চিঠি, কেন কেউ চুরি করবে?'

'ও কি?' তসলিমা কার্পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল এক পা।

'রক্তের দাগ। পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে হবে।'

আতিয়া কামরার ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কার্পেট ফুটো হয়ে যাবে কিন্তু!'

ফারুক বলল, 'উপায় কি? কেউ জিজ্ঞেস করলে বললেই হবে যে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে গিয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল।'

তসলিমা বলল, 'আপা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি। কোথায় শোব?'

ফারুক বলল, 'লাইব্রেরী রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল তসলিমা। ফারুক এবং আতিয়াও বের হলো। তসলিমা বলল, 'ফারুক ভাই, আপনাকে একটা উপকার করতে হবে কাল সকালে।'

'কি?'

তসলিমা বলল, 'আমি এমদাদের গাড়িটা রেখে এসেছি মাঠের এক ধারে। তাকে ফোন করে বলে দিতে হবে, গাড়িটা যেন সে এসে নিয়ে যায়। ফোন নাম্বার লিখে নিন···।'

ফোন নাম্বার লিখে নিয়ে ফারুক বলল, 'কোন্ মাঠে রেখে এসেছ? জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে না?'

'আমাদের এই পাড়ার শেষ মাথায় যে মাঠ, সেখানে।'

'অ্যাঁ! করেছ কি তুমি? ইশ্, শেষ রক্ষা বুঝি আর করা গেল না!'

পাঁচ

চক্রবর্তী লেনের পঁচিশ নম্বর বাড়িতে হত্যাকাণ্ড ঘটে রাত্রে, সেই একই দিনের বেলা এগারোটার ঘটনা।

তীব্র বেগে ছুটছিল রাজপথ ধরে ঝকঝকে একখানা মার্সিডিজ গাড়ি। ড্রাইভারের সীটে বসে ছিল সুদর্শন, সুপুরুষ এক দীর্ঘকায় যুবক।

ক্লিনশেভন, কমপ্লিট স্যুট পরিহিত, চোখে সানগ্লাস, হুইল ধরা বাঁ হাতে দামী, সুগন্ধী হাভানা চুরুট।

মি. সিম্পসনকে যদি কেউ হলপ করেও বলে দিত ওই যুবকই স্বয়ং কুয়াশা, তিনি মুহূর্তের জন্যেও কথাটা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আসলে যুবকের পরিচয়, সে ছদ্মবেশী কুয়াশা।

তার পাশে বসে ছিল এক ইরানী প্রৌঢ়। পরনে ছিল ঢিলেঢালা শেরওয়ানী, মাথায় লম্বা কারুকার্য খচিত পাগড়ী, পায়ে টেকনিকালার নাগরা। ইনি আর কেউ নন, আমাদের মি. স্যানন ডি. কস্টা, কুয়াশার অন্ধ ভক্ত।

মার্সিডিজ ঝড়ের বেগে ছুটছিল। ভয়ে আধ মরা হয়ে কুঁকড়ে বসেছিল ডি. কস্টা পাশের সীটে। মাথা নিচু করে বিড় বিড় করে যীশুকে ডাকছিল সে প্রতি সেকেণ্ডে বার পাঁচেক করে, মাঝেমধ্যে মাথা তুলে দেখে নিচ্ছিল, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে আর কত দেরি।

এমন সময় কুয়াশা কি দেখে সজোরে ব্রেক কষায় তীক্ষ্ণ, প্রায় কান ফাটানো শব্দ উঠল চাকার সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে। পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রকাণ্ড গাড়িটা।

'মি. ডি. কস্টা, রাস্তার ডান দিকে তাকান।'

শান্ত কিন্তু ভারি গলায় বলল কুয়াশা। নির্দেশ পাওয়া মাত্র যীশুর নাম ভুলে গেল ডি. কস্টা, মাথা উঁচু করে তাকাল রাস্তার ডান দিকে।

'সাদা স্যুট পরে ওই যে লোকটা হেঁটে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন?'

'ইয়েস বস্!'

'গাড়ি থেকে নেমে লোকটাকে ফলো করুন। সাবধান, ও যেন টের না পায় আপনি ওকে অনুসরণ করছেন।'

'টাহার পর কি করিটে হইবে বলুন। লোকটার ঘাড় ঢরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিব হাপনার কাছে?'

কুয়াশার হাসি পেলেও হাসল না সে। বলল, 'তার দরকার নেই। দেখবেন, মারপিট করতে যাবেন না। আপনি শুধু ওর পিছু পিছু গিয়ে দেখে আসবেন কোথায় থাকে ও।'

'ও. কে. বস্!'

গাড়ি থেকে ক্যাঙারুর মত লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাটখড়ির মত রোগা স্যানন ডি. কস্টা। গজ তিনেক এগিয়ে পিছন ফিরল সে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গাড়িটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মত।

মনে মনে গর্ব বোধ করল ডি. কস্টা। এতদিন সে যা অনুমান করে এসেছে সেটাই ঠিক, আজ তা নতুন করে আরও একবার প্রমাণিত হলো। তার ধারণা, কুয়াশা আশ্চর্য যাদু জানে। তার ধারণা যে সত্য, প্রমাণ হয়ে গেল আজ আবার। আশ্চর্য যাদুকরের সহকারী সে, এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা তার কাছে!

সাদা স্যুট পরা লোকটাকে অনুসরণ করতে করতে বার বার ডি. কস্টা পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল, যাদুকর মি. কুয়াশাকে হঠাৎ সে ঠিক তার পিছনে দেখতে পাবে এই আশায়। বসের সান্নিধ্য বড় প্রিয় তার। বস্ কাছে না থাকলে পৃথিবীটাকে জনহীন, নির্জীব, প্রতিকূল বলে মনে হয় তার।

সেদিনই সন্ধ্যার পর রিপোর্ট দিল ডি. কস্টা, 'বস্ লোকটা চক্রবর্টী লেনের পঁচিশ নাম্বার হাউজে ঠাকে। হামি টাহাকে ওই হাউজে ঢুকিটে

ডেকিয়াছি।'

কুয়াশা গাড়ি নিয়ে রওনা হচ্ছিল কোথাও, স্টার্ট দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। ঠিকানাটা দিয়ে শহীদকে আপনি আমার নাম করে বলবেন, লোকটা এবং লোকটার বাড়ির দিকে যেন নজর রাখে ও।'

স্যালুট করল ডি. কস্টা, 'ইয়েস বস্!'

সাঁ করে বেরিয়ে গেল কুয়াশার গাড়ি। ডি. কস্টাও শিস দিতে দিতে আস্তানা থেকে বেরোল। গন্তব্যস্থান প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের বাড়ি।

শহরের শোভা, আলোকমালা, যানবাহন ইত্যাদি দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে, এক টাকার ভাজা চিনাবাদাম কিনে খেতে খেতে রাত আটটার সময় সে পৌঁছল শহীদের বাড়িতে। কিন্তু শহীদ তখন বাড়িতে নেই, গেছে কোন ক্লাবে টেনিস খেলতে। কামাল ছিল, গল্প করছিল সে লীনার সাথে।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে কামাল এবং লীনাকে দেখে জিভ বের করে দাঁতে কামড় দিল, ঝট্ করে পিছিয়ে এসে সরে দাঁড়াল দরজার আড়ালে। কামালের সাথে লীনার প্রেম চলছে বহুদিন ধরে, জানে ডি. কস্টা। ওদেরকে এক সাথে বসে গল্প করতে দেখে ঠাট্টা মস্করা করার বুদ্ধিটা হঠাৎ খেলে গেছে তার মাথায়।

কামাল এবং লীনা ডি. কস্টার আচরণ দেখে কামরার ভিতর থেকে হো হো করে হেসে উঠল। কামাল বলল, 'মি. ডি. কস্টা, পালিয়ে গেলেন কেন, আসুন, ভিতরে ঢুকুন।'

দরজার আড়াল থেকে ডি. কস্টা নিচু গলায় বলল, 'নো-নো! হাপনারা প্রেমালাপ চালাইয়া যান, 'হামি এইখানে ওয়েট করি।

হাপনাডের প্রেমালাপ খটম হইলে সিগন্যাল ডিবেন, টখন হামি ভিটরে ইন করিব।'

কামাল হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল করিডরে। ডি. কস্টার একটা হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল সে ড্রয়িংরুমের ভিতরে, 'ওসব কৌশলে কাজ হবে না, বুঝলেন? ভেবেছিলেন লজ্জায় ফেলে নাকানি-চোবানি খাওয়াবেন, না? বলুন, কি জন্যে আগমন সাহেবের?'

কামাল সাহেব বলায় বেজায় খুশি হলো ডি. কস্টা। টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে ভারিক্কি চালে সে বলল, 'মি. শহীড খানকে ডেকিটেছি না যে?'

'ও গেছে ক্লাবে টেনিস খেলতে।'

'ফিরিবেন কখন?'

'দশটা-এগারোটার আগে নয়। কেন, কোন খবর আছে নাকি?'

ডি. কস্টা বলল, 'ইয়েস, নিউজ আছে।'

'আমাকে বলুন।'

ডি. কস্টা হাসল। প্যান্টের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুলতে দুলতে বলল, 'নো। হামার বুজম ফ্রেন্ড মি. কুয়াশা নিউজটা, আই মীন ইনফরমেশনটা, মি. শহীড খানকে ডিটে বলিয়াছেন।'

কামাল বলল, 'তাহলে ফোন করুন ওকে।'

ডি. কস্টা বলল, 'ফোনে সব নিউজ কি ডেয়া যায়? অলরাইট, হামি চলিলাম, পরে ডেকা করিব। মি. কামাল, হাপনাডেরকে এইভাবে বিরক্ট করাটে হামি ডুঃখিট।'

কামাল বলল, 'না-না, বিরক্ত করলেন কোথায়? আবার আসবেন, কেমন?'

'সট্যি, সিরিয়াসলি বলিটেছি, হামি ডুঃখিট। প্রেমালাপ পবিট্র জিনিস, কাহারও উচিট নয় বিরক্ট করা।'

কামাল বলল, 'কি আশ্চর্য! আপনি···।'

'ডোহাই আপনাডের, হামাকে ক্ষমা করিয়া ডিবেন। সট্যি হামি ডুঃখিট।'

বলতে বলতে ডি. কস্টা ড্রয়িংরূম ত্যাগ করল।

শহীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতের ওভারকোটটা গায়ে চড়াল ডি. কস্টা। শীত তবু বাধা মানে না। হাঁটতে হাঁটতে পকেটের টাকা-পয়সার একটা হিসেব করে নিল মনে মনে। একুশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র আছে। কোন বারে ঢুকে বিদেশী মদ্য পান করা সম্ভব নয়। এদিকে, শীতকে ঠেকাতে হলে পান না করলেও নয়। অগত্যা দেশী মদ খাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

পরিচিত এক আড্ডায় গিয়ে সেখানে ঘণ্টা দেড়েক কাটাল ডি. কস্টা। দেড় বোতল পান করার পর গা গরম হয়ে উঠল তার। আড্ডা থেকে বেরিয়ে হাঁটা ধরল চক্রবর্তী লেনের দিকে।

শহীদকে না পেয়ে কুয়াশার নির্দেশ নিজেই পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। চক্রবর্তী লেনের পঁচিশ নম্বর বাড়িটা এবং সেই সাদা স্যুট পরা লোকটার উপর নজর রাখবে সে আজ রাতে।

সোয়া এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার সময় চক্রবর্তী লেনে পৌঁছল ডি. কস্টা। কুয়াশা ইতোমধ্যে আরও গাঢ় হয়েছে, একহাত দূরের জিনিসও ভাল দেখা যায় না।

পঁচিশ এবং চব্বিশ নম্বর বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাতিহীন লাইটপোস্ট, ডি. কস্টা সেই লাইটপোস্টের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে

দাঁড়িয়ে রইল।

নির্জন, নিস্তব্ধ রাত্রি। পৃথিবীটা আছে কি নেই, বোঝবার উপায় নেই কোন। একটা কুকুরও কোথাও থেকে ডেকে উঠছে না। ঝিঁঝি পোকারাও মৌনতা অবলম্বন করেছে।

রাত তখন ক'টা, জানে না ডি. কস্টা। পঁচিশ নম্বর বাড়ির ভিতর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। কেউ যেন সজোরে বন্ধ বা উন্মুক্ত করল দরজার কবাট। তারপর নিস্তব্ধতা। একে একে কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর মানুষের গলার অস্পষ্ট আওয়াজ কানে ঢুকল তার। পঁচিশ নম্বর বাড়ির লোকজন জেগে উঠেছে। আলো জ্বলল দোতলার কয়েকটা কামরায়।

পঁচিশ নম্বর বাড়িটা রহস্যময় বাড়ি। ভাবল ডি. কস্টা। সাদা স্যুট পরা লোকটাকে সে এই বাড়িতেই ঢুকতে দেখেছে। বস্ তাকে বলেনি বটে লোকটা কে, কি তার পরিচয়—কিন্তু লোকটা যে খুব সুবিধের নয় তা তার মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিল ডি. কস্টা।

সময় বয়ে চলল। সেই সাথে শীতের প্রকোপও বাড়ছে। মিনিট বিশেক পর গেট খোলার শব্দে চমকে উঠল ডি. কস্টা। কিছু একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবার, ভাবল সে। রাত দুপুরে গেট খুলছে কেন?

লাইটপোস্টের আড়াল থেকে কুয়াশা ভেদ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পঁচিশ নম্বর বাড়ির গেটের দিকে। অস্পষ্ট ভাবে হলেও, সে যেন দেখল গেটের ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে কে যেন রাস্তার এদিক ওদিক দেখছে। একবার মনে হলো চোখের ভুল। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, না, ওই তো সরিয়ে নিল মাথাটা, এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

আরও ক'মুহূর্ত পর চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল ডি. কস্টার। প্রায় সাথে সাথে দেখল, পঁচিশ নম্বর বাড়ির ভিতর থেকে দুটো অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। ছায়ামূর্তিদ্বয় ধরাধরি করে কিছু একটা নিয়ে যাচ্ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না ডি. কস্টা। সে ছায়ামূর্তিদ্বয়কেই আবছাভাবে দেখতে পেল শুধু।

গলির দক্ষিণ প্রান্তের দিকে চলে যাচ্ছে ছায়ামূর্তিরা। ডি. কস্টা পিছু নেবার জন্যে পা বাড়াবে, এমনি সময় পিছন থেকে লোহার মত শক্ত একটা হাত তার ঘাড় চেপে ধরল, 'এই মিয়া! কে তুমি? রাত দুপুরে এখানে কি করছ?'

ডি. কস্টা দু'হাত দিয়ে ঘাড় মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে মিহি, যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে ককাতে আরম্ভ করল, 'মরিয়া গেলাম। ছাড়িয়া ডিন। মরিয়া গেলাম! ছাড়িয়া···!'

হাতটা ডি. কস্টার ঘাড় ছাড়ল না, তবে একটু শিথিল করল আঙুলগুলো। পিছন থেকে কর্কশ স্বরে বলল, 'কে তুমি?'

কুয়াশার পরিচয়ে পরিচয় দিলে, লোকটা যদি পুলিস হয়, নানা ঝামেলা বাধাবে তাকে নিয়ে। এই ভেবে ডি. কস্টা বলল, 'হামি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শহীড খানের অ্যাসিস্ট্যান্ট। ভাল চাও টো ছাড়িয়া ডাও আমাকে। টুমি কে? এটো রাটে টুমি এখানে কি করিটে আসিয়াছ?'

পিছন থেকে লোকটা হাসল একটু। বলল, 'আমি পুলিস। টহল দিচ্ছি। চলো, থানায় যেতে হবে তোমাকে।'

'হোয়াট? হামি মি. শহীড খানের···'

লোকটা ধাক্কা দিয়ে গলির উত্তর প্রান্তের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল ডি.

কস্টাকে, 'ওসব ধাপ্পাবাজি ছাড়ো! থানায় গিয়ে প্রমাণ করতে হবে তুমি রাজা-মহারাজা, নাকি চোর-ছ্যাঁচড়।'

পঁচিশ নম্বর বাড়ি থেকে যে ছায়ামূর্তিদ্বয় বেরিয়েছিল তারা গেছে দক্ষিণ দিকে, লোকটা ডি. কস্টাকে নিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। সুতরাং ছায়ামূর্তিদ্বয়কে অনুসরণ করার সুযোগটা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেল।

গলির শেষ প্রান্তে এসে লোকটা ঝুঁকে পড়ে ডি. কস্টার উরু জড়িয়ে ধরল একহাতে, অপর হাতটা তখনও ঘাড় ধরে আছে। ডি. কস্টাকে সজোরে ছুঁড়ে দিল লোকটা। কামানের মুখ থেকে নিক্ষিপ্ত গোলার মত শূন্যে উঠে গেল ডি. কস্টা। যীশুকে যে ডাকবে, লোকটা সে সময়ও দিল না তাকে।

ঝপাৎ করে শব্দ হলো। সাথে সাথে ডি. কস্টা অনুভব করল, বরফের মত ঠাণ্ডা পানি তাকে কামড়াচ্ছে নির্মমভাবে।

ভাগ্য ভাল, ডোবাটায় পানির গভীরতা ছিল না। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে ডাঙায় উঠল ডি. কস্টা। এদিক ওদিক তাকিয়ে লোকটাকে সে দেখতে পেল না কোথাও। ভিজে কাপড়ে হাঁটা ধরল সে।

হাঁটতে হাঁটতে কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর ডি. কস্টা হঠাৎ দাঁড়াল। এ কি করছে সে? দিক নির্ণয় না করে বোকার মত এতক্ষণ হেঁটে এ কোথায় পৌঁছেছে সে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তার কোথাও কোন মানুষজনের চিহ্ন দেখতে পেল না সে। রাস্তাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোনদিন সে আসেনি এদিকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী কর্তব্য কি ঠিক করার চেষ্টা করল ডি.

কস্টা। বস্ বলেছিলেন মি. শহীদকে খবর দিতে। তা সে দেয়নি. দিলে এই খারাবিটা ভোগ করত মি.. শহীদই। অপরদিকে, যা ঘটে গেছে. বসকেও বলা চলবে না। বললে তিনি জানতে চাইবেন, আপনি কেন গিয়েছিলেন চক্রবর্তী লেনে, আপনাকে তো আমি যেতে বলিনি?

মাথায় একটা বুদ্ধি এল। টেলিফোনের তার রয়েছে মাথার উপর। সেই তার অনুসরণ করে হাঁটা ধরল সে। খানিকদূর যেতেই একটা খাম্বা দেখতে পেল সে। খাম্বা থেকে তার চলে গেছে একটা বাড়ির ভিতর। বাড়িটায় টেলিফোন আছে। ডি. কস্টা বাড়িটার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলের বোতামটা চেপে ধরল তর্জনী দিয়ে।

রাত্রি তিনটের দিকে ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শহীদের। লেপের ভিতর থেকে হাত বের করে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকাতেই শহীদ শুনতে পেল দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার একটানা শব্দ। তারপর কাঁপা কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল ডি. কস্টার, 'মি. শহীড, হামি মস্ট এক বিপডে পড়িয়াছি। ডশ মিনিটের মঢ্যে যডি এক বোটল ব্র্যান্ডি না খাওয়াইটে পারেন, হামাকে আর লাইফে ডেকিটে পাইবেন না···।'

'হয়েছে কি? কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

সবিস্তারে সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করল ডি. কস্টা। কোত্থেকে ফোন করছে তাও বলল।

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। আপনি বাড়িটার গেটের কাছে অপেক্ষা করুন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল শহীদ। মহুয়াকে ঘুম থেকে জাগাল না ও। লেবুকে গেট বন্ধ করে দিতে বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

ন' মিনিটের মাথায় ডি. কস্টার সামনে থামল শহীদের ক্রিমসন কালারের ফোক্সওয়াগেন। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ডি. কস্টা এগিয়ে এল। শহীদ দরজা খুলে দিতে উঠে বসল সে. হাত পাতল সাথে সাথে, 'ব্র্যান্ডির বোটল ডিন।'

ব্র্যান্ডির একটা শিশি বের করে দিল শহীদ কোটের পকেট থেকে। ডি. কস্টা ছিপি খুলে কয়েক ঢোকে নিঃশেষ করল সেটা। শহীদ হাত বাড়িয়ে ব্যাক সীট থেকে একটা মোটা উলেন কম্বল তুলে নিল, সেটা ডি. কস্টার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, 'ভিজে কাপড় ছেড়ে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন।'

ডি. কস্টা তাই করল। ইতোমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে শহীদ, একে একে প্রশ্ন করে যা যা ঘটেছে সব নতুন করে আর একবার জেনে নিল শহীদ। সব শুনে নিয়ে বলল, 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। চলুন দেখা যাক, পঁচিশ নম্বর চক্রবর্তী লেনে রহস্যের কোন খোরাক পাওয়া যায় কিনা।'

ছয়

ফোক্সওয়াগেন ছুটছে। ডি. কস্টা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ওই যে মাঠটা ডেকিটে পাইটেছেন, উহার সাইড ডিয়া একটি রোড চলিয়া গিয়াছে। ওই রোড হইটে একটা গলিটে ঢুকিটে হইবে, ওই গলিটাই চক্রবর্তী লেন।'

মাঠের পাশে রাস্তা। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা বলে সামনের দৃশ্য ভাল দেখা যায় না। চক্রবর্তী লেনের কাছাকাছি পৌঁছল গাড়ি। শহীদ দেখল

মাঠের ভিতর রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে একটা পুরানো মডেলের অস্টিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ভেতরটা দেখছে উঁকি দিয়ে একজন খাকী ইউনিফর্ম পরা পুলিস কনস্টেবল।

কৌতূহল জাগল ওর মনে। গাড়ি থামাল তাই। নেমে পড়ল দ্রুত। কনস্টেবলের দিকে এগোতে এগোতে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

ঘাড় ফিরিয়ে শহীদকে দেখল কনস্টেবল, চিনতে পেরে সালাম করল সসম্মানে, বলল, 'স্যার কি খবর পেয়ে এসেছেন?'

'কিসের খবর?'

কনস্টেবলটি বলল, 'টহল দিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় দেখি একটা ঠেলাগাড়ি শাকসজী নিয়ে বাজারের দিকে যেতে যেতে উল্টে গেল। কাছে এসে দেখি এই অস্টিনের সাথে ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে। ধরাধরি করে ঠেলাগাড়িটাকে সিধে করে শাকসজী তুলে নিয়ে চলে গেল সেটা। অস্টিনটা কেউ ফেলে রেখে গেছে, নম্বরটা নেবার জন্যে পিছনে আসতেই ডান পাশে দেখি...ওই দেখুন না!'

সকাল হলেও কুয়াশা তখনও দূর হয়নি। দু'পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ল শহীদ, দেখল লম্বা হয়ে পড়ে রয়েছে একটা লোক। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালতেই পরিষ্কার দেখা গেল।

লাশটার পাশে বসে পরীক্ষা করল শহীদ। ক্ষতস্থান দেখল।

'অনেকক্ষণ হলো মারা গেছে। কেউ খুন করেছে লোকটাকে। ছোরা দিয়ে খুন করা হয়েছে।'

এদিক ওদিক তাকাল শহীদ, টর্চের আলো ফেলে তারপর আবার বলল, 'ছোরাটা দেখছি না, খুনী সেটা নিয়ে গেছে সাথে করে। কনস্টেবল, চেনো নাকি ভদ্রলোককে?'

কনস্টেবল বলল, 'চিনি না, তবে আজ রাতেই একে আমি দেখেছিলাম, স্যার। চক্রবর্তী লেনের মিস তসলিমার সাথে ফিরছিলেন।'

'কোথায় ফিরছিলেন?'

'মিস তসলিমাদের বাড়িতে। পঁচিশ নম্বর বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলাম আমি। রাত তখন ন'টার মত হবে, সঠিক সময় বলতে পারব না।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'এই এলাকার লোক নন ইনি, হলে তুমি চিনতে, তাই না?'

'জ্বী, স্যার। উনি এই এলাকার লোক না। স্যার, আমি যখন দেখি, ভদ্রলোকের গায়ে একটা ওভারকোট ছিল।'

'ভাল করে মনে করে দেখো।'

কনস্টেবল বলল, 'পরিষ্কার মনে আছে আমার, স্যার।'

শহীদ মৃতদেহের গায়ের কোটের পকেটগুলো সার্চ করল। একটা নোটবুক পাওয়া গেল শুধু। তাতে নাম-ঠিকানাও মিলল।

'নাম, শামিম কবির। ঠিকানা—নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণপাড়া। হুঁ। এ লোক চক্রবর্তী লেনে কেন এসেছিল জানতে হবে। আর গাড়িটা—কার হতে পারে?'

কনস্টেবল বলল, 'যিনি খুন হয়েছেন গাড়ি তার হতে পারে।'

শহীদ মাথা দোলাল, 'না, তা হতে পারে না। এ গাড়ি অন্য কেউ রেখে গেছে এখানে।'

কনস্টেবল অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে শহীদ বলল, 'কিভাবে জানলাম? খুঁটিয়ে দেখো, তুমি বুঝতে পারবে। লাশের নিচের মাটি দেখো, ভিজে নয়। বৃষ্টি হয়েছে মাঝরাতের দিকে, জানো তো?

কি প্রমাণ হলো? লাশটা এখানে আনার পর বৃষ্টি হয়েছে। আর গাড়ির চাকার দাগ দেখো, কাদার উপর দাগ রয়েছে। গাড়ির নিচেটাও দেখতে পারো, মাটি ভিজে। লাশ এখানে রেখে যাবার অনেক পরে গাড়িটা কেউ রেখে গেছে এখানে। সে যাক, তুমি থানায় ফোন করো এখুনি। ততক্ষণ আমরা আছি এখানে।'

কনস্টেবল দ্রুত চলে গেল। ডি. কস্টা গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ একপাশে। এবার সে মুখ খুলল, 'হাপনি কয়েকবার বলিলেন ডেড বডিটাকে এখানে নিয়া আসিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে—ইহার কারণ? লোকটাকে টো এইখানেও হট্যা করা হইয়া ঠাকিটে পারে?'

'পারে না। অনেকগুলো জিনিস দেখে বলছি একথা। যেমন, ধরুন, ওভারকোটের কথাটা। কনস্টেবল ভদ্রলোককে যখন দেখেছিল তখন এর গায়ে ওভারকোট ছিল, অথচ এখন নেই। এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেউ যদি বাড়ি থেকে বেরোয়, ওভারকোট থাকা সত্ত্বেও গায়ে না দেবার কারণ কি? আমার অনুমান, বাড়ির ভিতর খুন করা হয়েছে শামিম সাহেবকে। তিনি যখন খুন হয়েছেন তখন তার গায়ে ওভারকোট ছিল না। খুনী তাই লাশটা বাইরে আনার সময় লাশের গায়ে ওভারকোট চড়ায়নি। কারণ, ওভারকোটে ছোরা বিঁধবার ফুটো নেই।'

ডি. কস্টা বলল, 'বাট, মার্ডারার কি ছোরা ডিয়া ওভারকোট ফু টা করিটে পারিট না?'

'খুনী অত্যন্ত ধূর্ত বলে আমার বিশ্বাস, মি. ডি. কস্টা। তার জানা আছে, লাশ নিয়ে এক্সপার্টরা নাড়াচাড়া করবে। যেখানে কোটে ফুটো হয়েছে ঠিক সেই জায়গা বরাবর ওভারকোটে ফুটো করা অত সহজ

নয়, তা করতে গেলে বিশেষজ্ঞদের চোখে ত্রুটি ধরা পড়ে যাবে মনে করে সে ঝুঁকিটা নেয়নি।'

'মি. শহীড, হাপনার কি ঢারণা মি. শামিম পঁচিশ নাম্বার চক্রবর্টী লেনে মার্ডার হইয়াছেন?'

'সন্দেহ তো তাই হচ্ছে। আপনি গভীর রাতে ওই বাড়ির লোকজনদের জেগে উঠতে দেখেছেন। ওই বাড়ি থেকেই অত রাতে দুটো ছায়ামূর্তি বাইরে বেরোয়। কিন্তু, আমি ভাবছি, পিছন থেকে যে লোকটা আপনাকে অনুসরণে বাধা দিল, সে কে? এই তৃতীয় লোকটা দেখছি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'কেন?'

শহীদ বলল, 'লোকটা নিশ্চয়ই পঁচিশ নম্বর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। তা যদি বেরুত, আপনি শব্দ শুনতেন গেট খোলার, তাকে দেখতেও পেতেন। ফোন করে ওই বাড়ির কেউ যে লোকটাকে নিযুক্ত করবে আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে, তাও সম্ভব নয়। কারণ, আপনিই বলেছেন, পঁচিশ নম্বরে ফোন নেই। লোকটা কারও কাছ থেকে কোন সংবাদ বা অনুরোধ পেয়ে নয়, স্বেচ্ছায় আপনাকে বাধা দিয়েছে অনুসরণে। মনে হচ্ছে, পঁচিশ নম্বর বাড়ির লোকদের শুভাকাঙ্ক্ষী সে। কিন্তু লোকটা জানল কিভাবে পঁচিশ নম্বর বাড়িতে কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে বা একটা লাশ সরাবার চেষ্টা করছে বাড়ির লোকেরা? এখানেই হলো সমস্যা।'

ডি. কস্টা কি যেন বলল। কিন্তু শহীদ অন্যমনস্কভাবে পরিত্যক্ত অস্টিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু হয়ে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল গাড়িটার ভিতরে। ডি. কস্টা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ব্যাক সীটে

একটা কালো চামড়ার ব্যাগ পড়ে রয়েছে, দেখল শহীদ।

খানিকপর ড্রাইভিং সীটের পিঠ থেকে দু'আঙুলের নখ দিয়ে কিছু একটা ধরে মাথা বের করে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও।

'কি বলুন তো এটা?'

'চুল। লম্বা ডেকিয়া বলা যায় ইহা কোন নারীর কেশ।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। গাড়িটা কোন মেয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল এখানে। প্রমাণ আরও আছে। কাদার দিকে তাকান। মেয়েদের হাই হিল জুতোর এক জোড়া দাগ চলে গেছে, ওই দেখুন, রাস্তার দিকে।'

ডি. কস্টা দেখল। মাথা দুলিয়ে বলল সে, 'মার্ডারার যেই হোক, হামাডের হাটে টাহার খারাবি আছে ডেকা যাইটেচে।'

কনস্টেবল ফিরে এল, 'ইন্সপেক্টর হায়দার আলী জীপ নিয়ে আসছেন, স্যার।'

শহীদ বলল, 'আমরা এখন যাব। পরে কথা বলব আমি তোমাদের বড় কর্তার সাথে।'

কনস্টেবল সালাম করে বিদায় নিল।

গাড়িতে চড়ে শহীদকে প্রশ্ন করল ডি. কস্টা, 'এখন কোন্ ডিকে?'

শহীদ বলল, 'যেদিকে যাচ্ছিলাম। চক্রবর্তী লেনের পঁচিশ নম্বর বাড়িতে। সব রহস্যের সমাধান ওই বাড়িতেই পাব বলে আশা করছি।'

ডি. কস্টা বলল, 'নো—এখন পেট-পূজা করিটে হইবে, টাহার পর অন্য কোন কঠা।'

মৃদু হেসে শহীদ বলল, 'ঠিক। খালি পেটে বুদ্ধি খোলে না, চলুন, আগে নাস্তাটা সেরে নিই কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকে।'

কুয়াশা ৭৪

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭৭

এক

সকাল আটটার সময় পঁচিশ নম্বর চক্রবর্তী লেনের গেটের কড়া নড়ে উঠল। মিনিট খানেক পর গেট খুলল একটি যুবতী। বলল, 'কাকে চান?'

শহীদ বলল, 'আপনি কি মিস তসলিমা?'

যুবতী বলল, 'আমি আতিয়া। তসলিমা আমার ছোট বোন। সে এইমাত্র অফিসে চলে গেল। কি দরকার আপনার তার সাথে?'

প্রশ্ন করে আপাদমস্তক কম্বল জড়ানো ডি. কস্টার দিকে তাকাল আতিয়া।

দাঁত বের করে হাসল ডি. কস্টা। আতিয়ার চোখের দৃষ্টি কঠোর হলো একটু।

শহীদ বলল, 'আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। শামিম কবির নামে এক যুবক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছি। শামিম সাহেব সম্ভবত আপনার বোনের সাথে এ বাড়িতে এসেছিলেন গতকাল রাতে।'

আতিয়ার মুখ শুকিয়ে গেল নিমেষে, লক্ষ করল শহীদ।

'শামিম আমাদের দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই। তসলিমার সাথে ওর দেখা হয়েছিল কোন ক্লাবে। শামিমকে তসলিমা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল ঠিক, কিন্তু সে তো খানিকপর বিদায় নিয়ে ফিরে গেছে নারায়ণগঞ্জে।'

'ক'টার সময় বিদায় নিয়েছিলেন?'

'ন'টা সাড়ে ন'টা হবে। কিন্তু তার সম্পর্কে এতকথা কেন জানতে চাইছেন আপনি?'

শহীদ বলল, 'আমাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো আর সব কথা বলা যায় না।'

ইতস্তত করতে লাগল আতিয়া। অবশেষে সে বলল, 'আসুন। মা অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন কিনা, ঘর-দোর অগোছাল হয়ে আছে।'

গেট অতিক্রম করে বাগানের মধ্যে দিয়ে হলঘরে ঢুকল শহীদ, ওর পিছু পিছু ডি. কস্টা।

হলঘরে পা দিয়েই একটা সোফা দৃষ্টি আকর্ষণ করল শহীদের। সোফার উপর একটা কম্বল অযত্নের সাথে ফেলে রাখা হয়েছে, একটা বালিশও রয়েছে তার সাথে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল শহীদ বালিশটার দিকে। সোফায় যে কেউ রাতে শুয়েছিল, বুঝতে পারল ও। মাথা রাখার ফলে গর্ত হয়ে গেছে বালিশের মাঝখানে।

অন্য একটি সোফায় বসল শহীদ। ডি. কস্টা আগেই বসে পড়েছে একটি চেয়ারে।

'বলুন, কি জানতে চান?' আতিয়া একটা দেয়াল-আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

শহীদ আতিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল, 'শামিম কবির গত রাতে খুন হয়েছেন। আমি এসেছি ব্যক্তিগত ভাবে তদন্ত করতে।'

'কি! কি বললেন?' আঁতকে ওঠার ভান করল আতিয়া।

'খুন যে হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোরা মেরে খুন করা

হয়েছে তাঁকে। এই গলির শেষে যে মাঠ, সেই মাঠের ধারে ফেলে রাখা হয়েছে লাশটা।'

'এ আপনি কি বলছেন? আমি যে বিশ্বাসই করতে পারছি না। কে খুন করল শামিমকে?'

'খুন যেই করুক, ধরা সে ঠিকই পড়বে সময় মত। গতকাল রাতে আপনার বোনের সাথে শামিম সাহেবকে দেখা গেছে, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে দেখা করলে অনেক তথ্য পাব। বিদায় নিয়ে যখন তিনি চলে যান, সাথে কি কেউ গিয়েছিল তাঁর?'

'না তো! শামিম একাই যায়।'

শহীদ পাইপ এবং এরিনমোরের কৌটা বের করল। নিস্তব্ধতা নামল হলঘরে। পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে প্রশ্ন করল ও, 'তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা বলতে পারেন আপনি?'

'শামিমের শত্রু? অসম্ভব বলে মনে হয়। খুবই ভাল ছেলে ছিল সে...তবে, কতটুকুই বা জানতাম আমরা তার সম্পর্কে। শত্রু থাকলেও, আমরা ঠিক বলতে পারব না।'

'তাহলে কেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, অনুমান করে কোন ধারণা দিতে পারবেন না, তাই না?'

'কি করে বলব বলুন? তবে, ওর কাছে বেশ কিছু টাকা ছিল। তসলিমার সাথে এই হলঘরে ঢুকে কি একটা কথার উত্তরে ও বলেছিল, হাউজী খেলতে গিয়ে আট হাজার টাকা জিতেছে। এমন হয়তো হতে পারে, গুণ্ডা বদমাশরা অনুসরণ করেছিল, এ-বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেখে বাইরে অপেক্ষা করছিল তারা। বিদায় নিয়ে ও যখন আবার বের হয়, তারাও পিছু নেয় আবার। তারপর মাঠের কাছে যেতে আক্রমণ

করে…।'

শহীদ বলল, 'সেরকম কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। গুণ্ডা-বদমাশ যদি পিছু নিত, এ বাড়িতে শামিম সাহেব ঢোকার আগেই তারা খুন করত তাঁকে। এটা যে শামিম সাহেবের বাড়ি নয়, তিনি আবার বাড়ি থেকে বেরুবেন—একথা তারা জানবে কেমন করে?'

'তাদের মধ্যে এমন কেউ হয়তো ছিল যে শামিমকে চিনত।'

শহীদ বলল, 'আচ্ছা, শামিম সাহেব কি হেঁটে এসেছিলেন? নাকি সাথে গাড়ি ছিল?'

'গাড়ি নেই শামিমের।'

শহীদ বলল, 'আপনি শামিম সাহেব সম্পর্কে যা যা জানেন বলুন দেখি ধীরে ধীরে। দেখবেন, কোন কথা যেন বাদ না পড়ে।'

আতিয়া বলল, 'ওর সম্পর্কে আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না। বাবার বহু দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের ছেলে, নারায়ণগঞ্জে চাকরি করে, ওখানেই থাকে। বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই। একটু চাপা স্বভাবের। মাথার ওপর গার্জেন কেউ নেই বলে আচার-ব্যবহারে বেশ একটু বেপরোয়া। আমাদের এ বাড়িতে খুবই কম যাতায়াত। গত তিনমাসে গতকালই প্রথম এসেছিল।'

আতিয়া কথা বলছিল, শহীদ তাকিয়ে ছিল পাশের সোফার উপর ফেলে রাখা বালিশটার দিকে। এক সময় হাত বাড়িয়ে দু'আঙুলের নখ দিয়ে লম্বা একটা চুল তুলে নিয়ে চোখের সামনে আনল ও।

চুলটা যারই হোক, তার মাথার চুল যে কোঁকড়ানো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এই চুলটা যার, মাঠের ধারে ফেলে রেখে আসা অস্টিনের ভিতর যে চুলটি পাওয়া গেছে সেটিও তার। অর্থাৎ দুটো চুলই

একই মাথার।

শহীদ মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করল, এই হলঘরের সোফায় এ বাড়ির ছোট মেয়ে তসলিমা রাত কাটিয়েছে। একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগল ওর মনে, নিশ্চয়ই তসলিমার আলাদা কামরা আছে—সেখানে না শুয়ে হলঘরের সোফায় কেন সে শুয়েছিল?

তাহলে দেখতে হয় ছোট মেয়ের শোবার কামরাটা। শহীদ উৎসুক হয়ে উঠল মনে মনে। ঠিক সেই সময় জানালার দিকে নজর পড়তে ও দেখল বাগানের মধ্যে দিয়ে একজন লোক দ্রুত এগিয়ে আসছে হলঘরে ঢোকার দরজার দিকে।

লোকটার চেহারাটা যেন কেমন কেমন ঠেকল শহীদের। মুখ দেখে মনে হয় সজীব তারুণ্য বিদ্যমান তার মধ্যে, কিন্তু ভুরু এবং মাথার চুল মনে হয় পরিণত প্রৌঢ় মানুষের।

কড়া নড়ে উঠল দরজার। আতিয়া দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন, আমি দেখি কে আবার এল।'

দরজা খুলে আতিয়া পাশের বাড়ির জাহাঙ্গীর হোসেনকে দেখল।

'ও, আপনি, জাহাঙ্গীর ভাই।'

জাহাঙ্গীর হোসেন বলল, 'তসলিমা কোথায়, আতিয়া?'

'সে তো অফিসে চলে গেছে।'

জাহাঙ্গীর হোসেন বলল, 'তসলিমা এই সেন্টটা চেয়েছিল আমার কাছ থেকে। পাওয়া যায়নি এতদিন। দিতে পারিনি বলে খেপে আছে আমার ওপর। এক বন্ধুকে বলে রেখেছিলাম, এই একটু আগে সে দিয়ে গেল। এটা রাখো, ও এলে দিয়ো ওকে।'

আতিয়া বলল, 'তসলিমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এ তো দেখছি

খুবই দামী জিনিস, এত দামী জিনিসের জন্যে বায়না ধরলেই হলো!'

'আহা, তাতে কি! শখ হয়েছে, চাইবে নাইবা কেন! ওকে কিছু দিতে পারা সে তো আমার জন্যে আনন্দের ব্যাপার। আচ্ছা, যাই তাহলে, কেমন? ভাল কথা, গত রাতে সবাই নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পেরেছিল তো? ইস! গত রাতের মত কুয়াশা আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি।'

'সত্যি…।'

'আমি তো নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে বাইরে বেরিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলাম! গাড়ি-ঘোড়া কিচ্ছু পেলাম না। অগত্যা রাতটা কাটিয়ে দিতে হলো সিনেমা হলের চত্বরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।'

জাহাঙ্গীর হোসেনের সাথে কথা বলছে আতিয়া, এই ফাঁকে শহীদ সোফা ত্যাগ করে তরতর করে উঠে গেল উপরতলায়।

সিঁড়ির মাথার কাছে যে কামরাটা, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে শহীদ অনুমান করল, গৃহকর্ত্রীর কামরা হবে এটা। তার পরেরটার দরজা খোলা। করিডর থেকেই কামরার ভিতরের টেবিল, টেবিলের উপর আতিয়ার বাঁধানো ছবি দেখা যাচ্ছে। এটার সামনে থেকে সরে তৃতীয় কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ।

দরজা ভেজানো। ঠেলা দিতেই খুলে গেল সেটা। নিঃশব্দে কামরার ভিতর ঢুকল শহীদ। এ কামরায় যে কোন মেয়ে থাকে তা আলনার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল ও। বিছানার দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল ও। কামরার অন্যান্য জিনিস অগোছাল অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু বিছানাটা একেবারে নিভাঁজ। কেউ যেন এ বিছানায় শোয়নি। পোড়া গন্ধটা নাকে ঢুকেছে, ঢোকার সাথে সাথে। কার্পেট পোড়া দেখে ভুরু কুঁচকে গেল

ওর। এমন সময় নিচে থেকে হলঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ ভেসে এল। শহীদ কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল।

নিচে থেকে বিস্মিত আতিয়া বলে উঠল, 'ও কি! আপনি ওপরে কেন গেছেন?'

'আপনার বোনের কামরাটা দেখার জন্যে।'

আতিয়া বিরক্তির সাথে জানতে চাইল, 'কেন?'

শহীদ নিচে নামতে নামতে বলল, 'একটা ধাঁধার উত্তর পাচ্ছিলাম না। তাই কামরাটা দেখার দরকার ছিল। উত্তরটা পেয়ে গেছি কামরা দেখে।'

আতিয়া বলল, 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'আচ্ছা, কার্পেটটা পুড়ে অমন গর্ত হয়ে গেল কি করে, বলুন তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল শহীদ।

আতিয়া নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে বলল, 'গত হপ্তায় তসলিমা ওর সোয়েটার পরিষ্কার করছিল, অসতর্ক থাকায় এক শিশি পেট্রল ফেলে দেয়, তাতেই আগুন ধরে যায় হঠাৎ করে। আগুন নেভাবার আগেই অমন দামী কার্পেটটা পুড়ে গেল।'

শহীদ হাসতে হাসতে বলে বসল, 'মিস আতিয়া, আপনি আসলে মিথ্যে কথা বলতে জানেন না। সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল।'

মুহূর্তে ফণা তোলা নাগিনীর মত ফুঁসে উঠল আতিয়া, 'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ। এক হপ্তা আগে কার্পেট যদি পুড়ত, পোড়ার গন্ধটা এখনও কামরার ভেতর থাকত না। তাছাড়া এক শিশি পেট্রল পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যাওয়ায় যদি কার্পেটটা অতখানি পুড়তে পারে তাহলে পাশের শো কেসের পায়াগুলো অন্তত আগুনের শিখায় খানিকটা করে

পুড়ত। কিন্তু পোড়া তো দূরের কথা, পালিশ পর্যন্ত যাকে তাই আছে, একেবারে নতুনের মত চকচকে। তাই বলছি, মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস, আগুন দুর্ঘটনাবশত ধরেনি। ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়ে কার্পেটটা পোড়ানো হয়েছে।'

'আপনি প্রলাপ বকছেন। দয়া করে বিদায় হোন, আপনার সাথে কথা বলতে রুচি হচ্ছে না আমার।'

শহীদ সোফায় বসল, তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বলল, 'যাব বৈকি, তবে প্রকৃত সত্য না জেনে যাই কি করে! মিস আতিয়া, আপনি হয়তো ভাবছেন আপনাদেরকে বিপদে ফেলার জন্যে আমি এখানে এসেছি। তা যদি ভেবে থাকেন, ভুল করছেন, আমি প্রকৃত সত্য জানার জন্যে এসেছি। আপনারা যদি কোনও ব্যাপারে কোন দোষ বা অপরাধ করে না থাকেন, চিন্তার কিছু নেই তাহলে। আমিই আপনাদেরকে আমার সাধ্যমত সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য আমাদের দরকার নেই।'

শহীদ পাইপে অগ্নিসংযোগ করল, 'কিন্তু আমার ধারণা ঠিক উল্টো। সে যাক, আমার বিশ্বাসের কথা বলি এবার। মিস আতিয়া, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে শামিম কবির আপনাদের এই বাড়িতে খুন হন। তাঁকে এ বাড়িতে খুন করে, তাঁর লাশটা ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে এ পাড়ার দক্ষিণের মাঠে।'

'মিথ্যে কথা।' প্রায় চিৎকার করে প্রতিবাদ করল আতিয়া।

শহীদ বলল, 'আপনার উত্তেজনাই প্রমাণ করছে আমি যা বলছি তা সত্যি। কি জানেন, অকাট্য প্রমাণ না পেয়ে আমি নিজের বিশ্বাসের কথা বলি না।'

আতিয়া একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, 'আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। শামিম আমাদের ভাই, তাকে কেন আমরা খুন করতে যাব?'

'টাকার জন্যে, সম্ভবত। গতকাল আপনার বাবা দশ হাজার টাকা হারিয়ে ফেলেছেন।'

আতিয়া ঢোক গিলে বলল, 'তাও আপনি জানেন?'

'জানতাম না, খানিক আগে জানলাম। কে যেন এসেছিলেন দরজায়, তাকে আপনি কি একটা প্রশ্নের উত্তরে বলছিলেন।'

আতিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই তসলিমাকে ভিতরে ঢুকতে দেখল।

'তসলিমা, তুই এই অসময়ে ফিরে এলি...'

আতিয়াকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তসলিমা বলল, 'চাকরিটা চলে গেল, আপা! গতকাল আমাদের বসের স্ত্রী আমাকে বলড্যান্স করতে দেখেছিল, সে স্বামীকে বাধ্য করেছে...।'

হঠাৎ শহীদ এবং ডি. কস্টাকে দেখে চুপ করে গেল তসলিমা, তাকাল আতিয়ার দিকে, 'এরা কারা?'

আতিয়া বলল, 'শামিম নাকি খুন হয়েছে, উনি বলছেন। আর শামিমকে নাকি টাকার লোভে আমরাই খুন করেছি।'

এতটুকু অবাক হতে দেখল না শহীদ তসলিমাকে। মেয়েটি বরং ওকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, 'আপনি বুঝি গোয়েন্দা?'

শহীদ বলল, 'আমার নাম শহীদ খান।'

'ধন্য হয়ে গেলাম। আপনার মত বিখ্যাত মানুষ আমাদের বাড়িতে আসবেন, এ ভাবা যায় না। আচ্ছা, কি চান আপনি বলুন?'

'সত্য জানতে চাই।'

তসলিমা ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে কথা বলছিল। শহীদের কথা শুনে তার চেহারা বদলে গেল আমূল। হাসি হাসি ভাবটার জায়গায় গাম্ভীর্য ফুটে উঠল চেহারায়। এগিয়ে এসে বসল সে একটা চেয়ারে। বলল, 'সত্য জানতে চান, না? বেশ, মন দিয়ে শুনুন। শামিম গতরাতে জোর করে আমার কামরায় ঢুকেছিল, তাই রাগে উন্মাদ হয়ে তাকে আমি ছোরা দিয়ে আঘাত করি। মেরে ফেলার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু পরে আবিষ্কার করি, মরেই গেছে। তাই লোক দিয়ে লাশটা মাঠে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করি। এখন বুঝতে পারছি, ভুলই হয়ে গেছে অন্য লোককে লাশ ফেলার দায়িত্ব দিয়ে। যাক, চলুন, থানায় যাই।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল শহীদ তসলিমা থামতেই। হাসি থামতে বলল, 'নাহ্! দু'বোনই দেখছি একরকম। মিথ্যে কথা গুছিয়ে বলতে জানেন না।'

তসলিমা রক্তচক্ষু মেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তার মানে? আমার কথা বিশ্বাস করছেন না আপনি?'

শহীদ বলল, 'করছি। এবং তার কারণও আছে। আপনি তো গতরাতে আপনার কামরায় শোনইনি। শামিম সাহেব যখন খুন হয় তখন সম্ভবত আপনি চক্রবর্তী লেনেই ছিলেন না। বাড়ি ফিরেছেন শামিম সাহেব নিহত হবার অ-নে-ক পরে। কুয়াশায় পথ ভাল দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে গাড়িটা রেখে এসেছেন মাঠের ধারে। বাড়ি ফিরে হাতে দু'এক ঘণ্টা যা সময় পান, ওই সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দেন। বলুন, এসব কথা ঠিক কিনা?'

তসলিমা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল শহীদের দিকে। খানিকপর অস্ফুট কণ্ঠে সে বলল, 'এ কি! আপনি দেখছি সবই জানেন!' আতিয়ার

দিকে প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে তাকাল সে।

আতিয়া বলল, 'তুই চুপ করে থাক, তসলিমা।'

তসলিমা বলল, 'আর চুপ করে থেকে কচু হবে। যা সত্যি বলে ফেললেই তো হয়। দেখা যাচ্ছে এ ভদ্রলোক নিজের পেশায় মাস্টার, আমরা না বললেও অনায়াসে সব জেনে নেবার ক্ষমতা রাখেন।'

আতিয়া ধমকে উঠল, 'তসলিমা! চুপ করলি?'

'চুপ করে থাকলে কি লাভ হবে, আপা?'

শহীদ বলল, 'হবে না। বরং আমি যদি সব কথা জানতে পারি, আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব। অবশ্য, আপনারা যদি শামিম সাহেবকে খুন না করে থাকেন, তবেই।'

'আমরা খুন করিনি। আমরা জানিও না, কে খুন করেছে।'

শহীদ নড়েচড়ে বসল, 'তাহলে বলুন সব খুলে।'

তসলিমা বলল, 'আপনাকে যে বলব, প্রমাণ কি আপনি মি. শহীদ খান, প্রাইভেট ডিটেকটিভ?'

শহীদ কোটের পকেট থেকে পরিচয় পত্র বের করে বাড়িয়ে ধরল। তসলিমা উঠে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করল সেটা, পড়ল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনাকে সব কথা বলা মানে পুলিসকে বলা, তাই নয় কি?'

'তা নয়। পুলিসকে মাঝে মধ্যে আমি সাহায্য করি বটে কিন্তু পুলিসের পদ্ধতির সাথে আমার পদ্ধতি কখনও মেলে না। পুলিস অপরাধীকে ধরে শাস্তি দেয়, আমি অপরাধীকে কেন অপরাধ করেছে, কোন্ বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সে অপরাধ করেছে, সে যা করেছে তা অপরাধের সংজ্ঞা অনুযায়ী অপরাধের মধ্যে পড়ে কিনা বিশেষভাবে বিচার করে দেখি। সত্যানুসন্ধানী আমি। নিরপরাধকে সবরকম সাহায্য

করি। এইখানেই প্রভেদ।'

আতিয়া প্রশ্ন করল, 'এই ব্যাপার নিয়ে আপনার এত মাথা ব্যথার কারণ কি? আমরা গরীব মানুষ, আপনাকে তো ফী দিতে পারব না।'

শহীদ বলল, 'আমি টাকা নিই না। গোয়েন্দা হয়েছি শখে।'

'তাহলে কেন…?'

'সত্য প্রকাশ পাক, এই চাই। শামিমকে খুন করল কে জানতে চাই।'

আতিয়া বলল, 'কে খুন করেছে আমরা তা জানি না।'

শহীদ বলল, 'সেক্ষেত্রে, একটা কথা বলি। আমার সঙ্গে এই যে মি. স্যানন ডি. কস্টা, ইনিও একজন ডিটেকটিভ। আমাকে সাহায্য করছেন এই কেসে। যে-কোন কারণেই হোক, ইনি আপনাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছিলেন গতরাতে। ইনি দু'জন লোককে গভীর রাতে এ বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছেন। লোক দু'জন একটা মৃতদেহ ধরাধরি করে নিয়ে গেছে মাঠের দিকে।'

শেষ কথাটা অনুমান করে বলল শহীদ।

আতিয়া চুপ করে রইল, যেন বোবা হয়ে গেছে হঠাৎ করে। আর তসলিমা দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে। নিস্তব্ধতা ভাঙল সে-ই। 'আপনি যখন এত কথা জেনে ফেলেছেন, তখন আর বাকি কথা লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। শুনুন, সত্য প্রকাশ করছি। শামিমকে কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে কিংবা ও আমার কামরায় কেন ঢুকেছিল—এসব আমরা কিছুই জানি না। খুনী কিভাবে ঢুকেছিল আর কিভাবেই বা বেরিয়ে গেছে, তাও একটা রহস্য হয়ে রয়েছে আমাদের কাছে।'

'কামরাগুলোর দরজা জানালা কি সব বন্ধ ছিল?'

'হ্যাঁ। শুধু এই হলঘরের, ওই আপনার সামনের জানালাটার শার্সি খোলা ছিল। ওটা আম্মা খোলা রেখেছিলেন, বন্ধ করতে ভুলে যাই আমরা। খুনী যদি বাইরে থেকে এসে থাকে, নিঃসন্দেহে তাই এসেছে, তাহলে একমাত্র ওই খোলা জানালা দিয়েই সে এসেছে বলে মনে করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জানালার শার্সি ভেজানো ছিল, খুনী জানল কিভাবে ওটা খোলা আছে? তাছাড়া, গভীর রাতে জোরে দরজা বা জানালা খোলা বা বন্ধ করার একটা শব্দ হয়, সেই শব্দেই ঘুম ভেঙে যায় সকলের। তারপর আমার কামরায় আবিষ্কৃত হয় শামিমের লাশ। কিন্তু শব্দটার উৎস বা কারণ আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি।'

শহীদ বলল, 'বাইরে থেকে খুনী এসেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। বাড়ির লোকদের মধ্যে কেউ...।'

'সবাই তাই ভাববে। আর সেইজন্যেই লাশটা আমরা বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই।'

শহীদ বলল, 'কাজটা অন্যায় করেছেন। পুলিসকে বোকা বানাবার চেষ্টা করাটাও একটা অপরাধ।'

আতিয়া বলল, 'তখন অত কথা ভাববার সময় ছিল না। তাছাড়া, তখন ফারুক সাহেবের প্রস্তাবটা একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিল আমাদের সকলের।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'ফারুক সাহেব?'

'তিনি আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকেন বলতে পারেন। আমাকে পড়ান, চাকরিও করেন।'

'তিনিই তাহলে লাশ সরাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। তিনি এ প্রস্তাব আমাদের সকলের নিরাপত্তার স্বার্থে

দিয়েছিলেন।'

শহীদ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'শামিম সাহেব শুয়েছিলেন কোথায়?'

'এই হলঘরে, ওই সোফায়।'

শহীদ বলল, 'ফারুক সাহেবের একটা ফটো চাই আমি, দিতে পারেন?'

আতিয়া বলল, 'নেবেন।'

শহীদ খানিকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল। তারপর বলল, 'বাড়ির ভিতর-বাহির ভাল করে দেখতে চাই আমি একবার, আপত্তি নেই তো?'

'দেখুন। তবে, আম্মাকে বিরক্ত করতে পারবেন না।'

'বেশ। ছাদে ওঠার কি ব্যবস্থা?'

'সিঁড়ি আছে।'

'দরজা আছে সিঁড়িতে?'

'না।'

শহীদ উঠল। ডি. কস্টার দিকে তাকাতে হাসি পেল ওর। ডি. কস্টা এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। তার কারণ এবার বুঝতে পারল শহীদ। সারারাত জেগে বেচারা কখন নিজের অজান্তেই চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রথমে দোতলায়, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির ছাদে উঠে এল শহীদ। দু'বোনও ওকে অনুসরণ করে ছাদে উঠল। নিজেদের মধ্যে তারা ফিস ফিস করে কথা বলছে। শহীদ অবশ্য তাদের কথা শোনার কোন চেষ্টাই করল না।

বাড়িটার ডান পাশে চব্বিশ নম্বর বাড়ি। দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল

দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। পাঁচিলের প্লাস্টার খসে পড়েছে। যে-কেউ পাঁচিল টপকে ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে আসতে পারে। চব্বিশ নম্বর বাড়ির ছাদ এ-বাড়ির ছাদের কাছ থেকে মাত্র হাত তিনেক দূরে, এক লাফে এ-বাড়ির ছাদে যে-কেউ আসতে পারে।

'চব্বিশ নম্বর বাড়িতে কারা থাকেন?'

তসলিমা বলল, 'একটা লঞ্চ কোম্পানীর সুপারভাইজার, ভদ্রলোক প্রৌঢ়, চির কুমার, রাতদিন মদ খান, নাম আকরাম হোসেন চাকলাদার। কখন যে তিনি বাড়িতে থাকেন আর কখন থাকেন না, বলা মুশকিল।'

'এটা কি তার নিজের বাড়ি?'

'না। তিনি আজ বছর খানেক হলো ভাড়া নিয়েছেন।'

শহীদ ছাদের অপর প্রান্তে এসে দাঁড়াল। এ-পাশের বাড়িটা আরও যেন নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই। বাড়ির মধ্যবর্তী পাঁচিল খুবই উঁচু, প্রায় দু'মানুষ সমান হবে। নতুন পাঁচিল তোলা হয়েছে বা নতুন করে প্লাস্টার করা হয়েছে। দু'বাড়ির ছাদের দূরত্বও অনেক, তিন লাফেও এ বাড়ির ছাদে পৌঁছানো যাবে না।

'এ বাড়িটা?'

'এটা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের বাড়ি। তিনি নানারকম পাঁচ মিশালী ব্যবসা করেন। খুব ভাল মানুষ। এ পাড়ার সকলের সাথে মধুর সম্পর্ক আছে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছেন…।'

'থাক, থাক। অত প্রশংসা শুনলে হিংসা হয়। তিনি কি গত রাতে বাড়ি ছিলেন?'

'না। তিনি নাকি গত রাতে সিনেমা দেখতে গিয়ে কুয়াশার জন্যে

বাড়ি ফিরতে পারেননি!'

শহীদ বলল, 'হুঁ।'

এরপর শহীদ আতিয়াকে তার বাবার টাকা চুরির ঘটনা সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন করে নিচে নেমে এল। ডি. কস্টাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে, ফারুক চৌধুরীর একখানা পাসপোর্ট সাইজের ফটো আতিয়ার কাছ থেকে নিয়ে বিদায় নিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

দুই

গলির মুখে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে পঁচিশ নম্বর চক্রবর্তী লেনে ঢুকেছিল শহীদ এবং ডি. কস্টা। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গলি-মুখের দিকে পা বাড়াল ওরা।

বাড়ি ফিরছিল এই সময় ফারুক চৌধুরী। শহীদ এবং ডি. কস্টাকে দেখে থমকে গেল সে, স্যাঁত্ করে সরে গেল পরমুহূর্তে পাশের বাড়ির গেটের আড়ালে। শহীদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা, মার্জিত এবং শোভন পোশাক দেখে তার সন্দেহ হলো, ভদ্রলোক কেউকেটা গোছের কেউ হবেন।

ওরা গলি-মুখে অদৃশ্য হয়ে যেতে দুরু দুরু বুকে বাড়ির ভিতর ঢুকল সে। হলঘরে আতিয়া এবং তসলিমা ছিল, ঢুকেই সে প্রশ্ন করল, 'ওঁরা কারা এসেছিলেন?'

'ওঁরা ডিটেকটিভ—পুলিস নয়, প্রাইভেট।'

ফারুক মুখ বিকৃত করে বলল, 'এহ্! যা ভেবেছি—টিকটিকিরা কেন

এল?'

'কেন আবার, শামিমের খোঁজে!'

'জানল কিভাবে শামিম সাহেব…?'

আতিয়া বলল, 'শুধু তাই নয়, ওঁরা জেনেই এসেছেন—শামিম এ-বাড়িতে খুন হয়েছে, আমরা তার লাশ মাঠে ফেলে রেখে এসেছি—সব!'

'অ্যাঁ। তুমি সব অস্বীকার করেছ নিশ্চয়ই?'

আতিয়া বলল, 'কি অস্বীকার করব? অস্বীকার করলে ছাড়ত? ওঁরা সবই জানেন, স্বীকার না করে উপায় ছিল নাকি?'

ফারুক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, 'তার মানে সব বলে ফেলেছ? সর্বনাশ হয়েছে! এখন কি হবে?'

'কি হবে না হবে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আপনিই তো যত নষ্টের গোড়া!'

ফারুক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রইল আতিয়ার দিকে। পরমুহূর্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে, 'একেই বলে অকৃতজ্ঞ! তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যে…।'

'থামুন! কাকে রক্ষা করেছেন আপনি? বাবাকে? লজ্জা করে না বলতে? নিজে শামিমকে খুন করে বাবার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছেন?'

'কী! এত বড় কথা! আতিয়া, সাবধানে কথা বলো বলছি!' উঠে দাঁড়াল ফারুক, রাগে কাঁপছে সে।

'চোখ রাঙিয়ে কথা বলবেন না!' পাল্টা জবাব দিল আতিয়া।

তসলিমা মুখ খুলল এবার, 'থামো তো, আপা। মাথা গরম কোরো না। ফারুক ভাই, বিপদটা আমাদের এবং আপনার, দু'তরফেরই। এ সময় ঝগড়া-ঝাঁটি করা কি উচিত?'

ফারুক নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলল, 'কিন্তু সব কথা তোমরা স্বীকার করলে কোন্ বুদ্ধিতে! পুলিস বা টিকটিকি যাই সন্দেহ করুক, প্রমাণ করতে পারত কিছু? স্বীকার করায় সব প্রমাণ হয়ে গেল। টিকটিকিরা তোমাদেরকে বোকা বানিয়ে পেটের কথা বের করে নিয়ে গেছে।'

তসলিমা বলল, 'স্বীকার করেছি তো কি হয়েছে? ওঁরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, ওঁদের তদন্তের পদ্ধতি আলাদা। শহীদ সাহেব কথা দিয়ে গেছেন, একান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি পুলিসকে এখুনি সব কথা জানাবেন না।'

'কিন্তু তারা খবর পেল কোত্থেকে?'

'তা বলেননি। জানতে চাইলেও বলতেন কিনা সন্দেহ।'

ফারুক উত্তেজিত ভাবে বলল, 'নিশ্চয়ই ওদেরকে কেউ নিযুক্ত করেছে। কে সে? তার পরিচয় জানতেই হবে। বোঝা যাচ্ছে, সে আমাদের শত্রু। শত্রু কোনরকম অনিষ্ট করার আগেই তাকে খতম করা দরকার।'

'মানে?'

'পুলিসকে সে সব কথা বললেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার আগেই মুখ বন্ধ করতে হবে তার।'

'কিভাবে তা সম্ভব?'

ফারুক পায়চারি শুরু করল অস্থিরভাবে, 'যে ভাবেই হোক সম্ভব করতে হবে। বন্দুকের গুলি কিংবা ছোরার···।'

কি ভেবে পায়চারি থামাল ফারুক, শান্ত করার চেষ্টা করল নিজেকে। তারপর বলল, 'কি ভাবে কি করতে হবে তা তোমাদেরকে

ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা আমিই করব। কিন্তু মুখ বন্ধ রাখতে হবে তোমাদের।'

'শহীদ সাহেব তো সবই জেনে গেছেন। তসলিমার কামরাও দেখেছেন তিনি…।'

'ওপরেও নিয়ে গিয়েছিলে?'

আতিয়া বলল, 'আমি যখন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, সেই ফাঁকে শহীদ সাহেব একাই উপরে উঠে গিয়েছিলেন।'

'ইস্! জাহাঙ্গীরকেও তাহলে দেখেছে তারা?'

'সম্ভবত দেখেছেন। তাতে ক্ষতি কি?'

ফারুককে অপ্রতিভ দেখাল। খানিকপর বলল, 'ক্ষতি বৈকি! জাহাঙ্গীর দেখল তো, আমাদের বাড়িতে টিকটিকি আসা যাওয়া করছে! পাড়ার লোক যদি জানে—টি টি পড়ে যাবে না? নাহ্! মাথা ঘুরছে, যাই, শুয়ে শুয়ে চিন্তা করি, কি করা যায় নতুন করে।'

ফারুক ধীরে ধীরে উঠে গেল দোতলায়।

দুপুরের খানিকপর আজহার মল্লিক বাড়ি ফিরলেন। মেয়েদেরকে দেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে গায়ের কোট খুলে সোফার উপর রাখলেন। জানতে চাইলেন, 'আতিয়া, তোমার মা কেমন?'

'শুয়ে আছেন। শরীর ভাল নেই।'

সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। পিছন থেকে তসলিমা বলল, 'তোমার কোট…।'

কথা শেষ না করে তসলিমা সোফা থেকে কোটটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল, বাবার হাতে সেটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

চেয়ারে বসে ছিল আতিয়া. সে দেখল কোটের পকেট থেকে একটা নীল কাগজ পড়ে গেল মেঝেতে। কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে কি মনে করে মেলে ধরে পড়ল সে।

কাগজের লেখাটা পড়েই মাথা ঘুরে গেল আতিয়ার। অসুস্থ বোধ করল সে। চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল ঘন ঘন।

কাগজটা আজহার সাহেবের অফিসের একটা লেটারহেড প্যাডের শীট, তাতে লেখা:

'মি. আজহার মল্লিকের কাছ থেকে গতকালের কালেকশন বাবদ দশ হাজার টাকা সম্পূর্ণ বুঝে পেলাম। ইবনে গোলাম রসুল।'

আতিয়া জানে, গোলাম রসুল সাহেব বাবার বস্।

তার বাবা টাকা পেলেন কোথায় ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছে আতিয়ার। সে ভাবছে, তবে কি…?

সেদিনই বিকেলে মি. সিম্পসন হাজির হলেন শহীদের বাড়িতে। ফ্রুট কেক এবং দু'কাপ চা খেয়ে তিনি কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমন সকাল বেলা তুমি চক্রবর্তী লেনের দিকে কেন গিয়েছিলে, বলো তো?'

শহীদ বলল, 'ব্যক্তিগত একটা কাজ ছিল। ভাল কথা, কেসটা কি রকম বলুন তো, মি. সিম্পসন? কিছু জানতে পারলেন?'

'ইন্সপেক্টর হায়দার আলী তদন্ত করছে। জানা গেছে বেশ কিছু তথ্য। লাশের কাছে যে অস্টিনটাকে পাওয়া গেছে সেটার মালিক এমদাদুল হক নামে এক বখাটে যুবক। বছর খানেক আগে পর্যন্ত ছোকরা হাইজ্যাকার ছিল। পুলিসী ব্যবস্থা কড়াকড়ি হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে

ওসব। প্রকাশ্যে সে এখন তেমন কিছু করে না, তবে গোপনে নাকি অবৈধভাবে টাকা পয়সা কামায়। পিছনে লোক লাগানো আছে, তেমন কোন প্রমাণ নেই বলে এতদিন গ্রেফতার করার চেষ্টা হয়নি। এবার হয়তো বাছাধন রেহাই পাবে না।'

'তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?'

'সেই খুনী, তার বিরুদ্ধে ইন্সপেক্টর হায়দার খুনের অভিযোগ আনার কথা ভাবছে। তবে, প্রথমে তার সাথে কথা বলতে চায় হায়দার। জানো, গাড়িটা ওখানে ফেলে রেখে যাবার কারণটা কি? ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেলে রেখে যেতে হয়েছে তাকে গাড়ি।'

'মানে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'পেট্রল শেষ হয়ে গিয়েছিল, পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে ফেলে রেখে গেছে। আরও একটা ব্যাপারে ওকে জেরা করা হবে।'

'আরও একটা ব্যাপারে?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'চক্রবর্তী লেনের পঁচিশ নম্বর বাড়ির আজহার মল্লিকের দশ হাজার টাকা ভর্তি একটা ব্যাগ গতকাল কেউ অদলবদল করে ভদ্রলোককে সর্বস্বান্ত করেছে। এমদাদুল হক সিরাজীর অস্টিনে যে কালো চামড়ার ব্যাগটা পাওয়া গেছে সেটা ওই আজহার মল্লিকের ব্যাগ। আজহার মল্লিকের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল ব্যাগটা, বাড়ির লোকেরা সেটা সনাক্ত করেছে। কি দাঁড়াল ফলাফল? এমদাদই যে আজহার মল্লিককে ঠকিয়ে দশ হাজার টাকা চুরি করেছে, সন্দেহ আছে তাতে আর কোন?'

শহীদ চুপ করে রইল।

মি. সিম্পসন বলে চলেছেন, 'এমদাদ একটা নিশাচর। খামোকা সারারাত শহরময় ঘুরে বেড়ায় সে। আমার সন্দেহ, শামিমকে একা পেয়ে গাড়ি থামায় সে, শামিমের টাকা পয়সা কেড়ে নেয়, তারপর তাকে খুন করে।'

শহীদ এতক্ষণে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, মি. সিম্পসন, ধরুন, আপনি গাড়ি থামিয়ে একজন মানুষকে খুন করলেন, কেমন? আপনি জানেন আপনার গাড়ি পুলিস যদি সকালে লাশের কাছে দেখে, নির্ঘাত তারা আপনাকে খুনী বলে ধরে নেবে, তাই নয় কি? এরকম অবস্থায় কি করতেন আপনি?'

'তেল না থাকলে, স্বভাবতই তেল যোগাড় করার চেষ্টা করতাম।'

শহীদ বলল, 'অত রাতে তেল পেতেন না। আমি হলে কি করতাম বলব?'

'বলো। কি করতে?'

শহীদ বলল, 'নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, খানিকটা সামনে রাস্তা ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে পুব দিকে। গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে ওখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতাম। গড়াতে গড়াতে অনেকটা দূরে চলে যেত গাড়ি। তারপর সুযোগ সুবিধে মত আবার খানিকটা মাত্র ঠেলে কোন বাড়ির পাশে বা গলির মুখে রেখে দিতাম।'

মি. সিম্পসনকে চিন্তিত দেখাল, 'তাই তো! সেটাই তো হত বুদ্ধিমানের কাজ!'

শহীদ বলল, 'আমার কি ধারণা জানেন? হয় এমদাদ জানত না ওখানে একটা লাশ পড়ে আছে, নয়তো গাড়িটা তার হলেও, সে নিয়ে যায়নি ওখানে গাড়ি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'হায়দারকে তাহলে এসব কথা বলতে হয়। সে তো এমদাদকেই খুনী মনে করে বসে আছে। তার আরও একটা ধারণা, শামিম এবং এমদাদ দু'জন মিলে আজহার মল্লিকের টাকা চুরি করেছে। শামিম সংবাদ সংগ্রহ করেছে, কাজ হাসিল করেছে এমদাদ। তারপর, টাকার হিস্যা নিয়ে গোলমাল বাধে দু'জনের। মারামারি শুরু হতে এমদাদ খুন করে শামিমকে। এও একটা সম্ভাবনা। অন্তত হায়দারের তাই মনে হচ্ছে।'

শহীদ মুচকি হাসল শুধু, কোন মন্তব্য করল না। শহীদের বক্তব্য শোনার পর থেকে মি. সিম্পসন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাই বেশিক্ষণ বসলেন না, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন খানিকপর।

কামাল এল আধঘণ্টা পর। বলল, 'নারে, শামিম কবির কেন, গতকাল কোন ক্লাবেই কেউ আট হাজার টাকা জেতেনি হাউজীতে। সবচেয়ে বেশি পেমেন্ট দেয়া হয়েছে ইউনিক ক্লাবের হাউজীতে, ইব্রাহিম নামে এক বুড়োকে, তাও মাত্র সাতশো টাকা।'

শহীদ বলল, 'তাহলে শামিম টাকা পেয়েছিল অন্য কোন সূত্র থেকে। কিন্তু হাউজী খেলায় পেয়েছে বলেছিল কেন সে? নিশ্চয়ই টাকাটা অবৈধ উপায়ে রোজগার করেছিল, তাই। কি বলিস?'

কামাল বলল, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে!'

এমন সময়, ক্রিং ক্রিং শব্দ হলো। শহীদ হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফোনের রিসিভার, 'শহীদ খান স্পিকিং।'

ভারি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে, 'শহীদ, যে ফটোটা পাঠিয়েছ তুমি সেটা দেখলাম। ডি. কস্টা কোথাও ভুল করেছেন। আমি যে লোকটাকে অনুসরণ করতে বলেছিলাম ওঁকে,

ফটোর যুবক সে লোক নয়।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু ডি. কস্টা হলপ করে বলছে, সে লোকটাকে তোমার নির্দেশ মত সারাক্ষণ অনুসরণ করেছিল, লোকটাকে সে চক্রবর্তী লেনে পঁচিশ নম্বর বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে।'

অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, 'পঁচিশ নম্বর বাড়িতে পুরুষ মানুষ আর কে আছেন?'

'আজহার মল্লিক, প্রৌঢ়, বাড়ির কর্তা। ব্যস।'

'সেক্ষেত্রে, ডি. কস্টাই ভুল করেছেন।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে। আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি।'

'সাহায্যের দরকার হলে জানিয়ো। মহুয়া কেমন? তোমার পুত্র রত্নটি?'

শহীদ বলল, 'ভাল আছে সবাই।'

রিসিভার রেখে দিতে কামাল জানতে চাইল, 'কে, কুয়াশা?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ।'

শহীদকে চিন্তিত দেখে কামাল আর কোন প্রশ্ন করে বিরক্ত করল না ওকে। অন্দর মহলের দিকে পা বাড়াল সে। মহুয়াদির কথা মনে পড়ে যেতেই পেটটা কেন যেন খালি খালি লাগছে তার।

শহীদ পাইপ টানছে অন্যমনস্কভাবে আর ভাবছে, হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য কি?

ক্রিং ক্রিং!

আবার ফোনের বেল বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল শহীদ, 'হ্যালো!'

অপরিচিত একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল ফোনের অপর প্রান্ত

থেকে।

'আমাকে আপনি চিনবেন না। আপনি কি মি. শহীদ, প্রাইভেট ডিটেকটিভ কথা বলছেন?'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ। কে আপনি?'

'আমি এমদাদুল হক। মি. শহীদ, আমি চক্রবর্তী লেনের পঁচিশ নম্বর বাড়ি সম্পর্কে বেশ কিছু আশ্চর্য তথ্য জানি। তথ্যগুলো আপনার কাজে লাগবে।'

শহীদ বলল, 'তাই নাকি? বেশ তো, বলে ফেলুন।'

এমদাদুল হক বলল, 'না, ফোনে সে সব কথা বলা সম্ভব নয়। খুব গোপনীয় কিনা, কেউ যদি শুনে ফেলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'তাহলে আপনি চলে আসুন আমার বাড়িতে।'

'না, আমার পক্ষে এখন তা সম্ভব নয়। আপনি যদি দয়া করে আমার এখানে একবার কষ্ট স্বীকার করে আসেন…।'

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

এমদাদ বলল, '৩২ নং পুকুরঘাটা রোড, এখানেই পাবেন আমাকে।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু হাতে এখন কাজ রয়েছে, যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

এমদাদ বলল, 'প্লীজ, মি. শহীদ, দয়া করে একটিবার আসুন। আমিই যেতাম, কিন্তু পুলিস আমার পিছনে লেগেছে অকারণে। আমি বাইরে বেরুলেই ধরবে আমাকে। আপনি ভাববেন না, এখানে এলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না…!'

'আপনি বুঝি ভাবছেন ভয়ে আমি যেতে চাইছি না?'

'ছিঃ ছিঃ! তা কেন ভাবব? তবু বলছি, কোনরকম সন্দেহ থাকলে

সহকারীদের সহ, যত ইচ্ছে পিস্তল রিভলভার সাথে নিয়ে আসতে পারেন।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে, যাব আমি। তবে এখন নয়, রাত দশটার দিকে যদি সময় করতে পারি।'

এমদাদ বলল, 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ, মি. শহীদ।'

রিসিভার রেখে দিয়ে পাইপে নতুন করে আগুন ধরাল শহীদ। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে, ভাবল ও।

তিন

রাত দশটা। নির্জন, নিস্তব্ধ গোটা পুকুরঘাটা রোড। এমনিতেই শহরের একধারে বলে লোকজনের বসবাস এদিকে কম, তার উপর শীতের রাত, লোকজন তো দূরের কথা, একটা কুকুর বিড়ালও নেই রাস্তায়।

কুয়াশা আজও গাঢ় হয়ে নেমেছে। তবে গত রাতের মত নয়।

৩২ নং বাড়ির সামনের দিকটায় সারি সারি ক'খানা দোকান। সবগুলোই বন্ধ। পিছনের অংশটা গুদামঘর বলে মনে হয়। সদর দরজাটা খোলা।

কড়া নাড়তে কেউ সাড়া দিল না দেখে শহীদ বলল, 'চল্, ভেতরে ঢুকে দেখি কি অবস্থা।'

কামাল অনুসরণ করল শহীদকে। পাকা একটা উঠান দেখা গেল। অন্ধকার। টর্চ জ্বালল কামাল। কয়েকটা ছোট ছোট দরজা দেখে সেদিকে পা বাড়াল সে।

শহীদ বাধা দিল তাকে, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ওগুলো তো দোকানে ঢোকার ভেতর দিকের দরজা।'

কথাগুলো বলে শহীদ একটা ভেজানো দরজার দিকে পা বাড়াল।

বাড়িটা খুবই পুরানো, ভেঙে পড়ার মত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভেজানো দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। দরজাটা বেশ বড় এবং ভারী। ফুটো দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেখা বেরিয়ে আসছিল। শহীদ হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কবাট দুটো।

প্রকাণ্ড একটা হলঘর, এক ধারে একটা টেবিল ছাড়া আর কিছুই নেই। টেবিলের উপর জ্বলছে লম্বা একটা মোমবাতি।

ভিতরে ঢুকল শহীদ। কামাল ওকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কোথায় তোর এমদাদুল হক?'

শহীদ টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'একটুকরো কাগজ পড়ে রয়েছে দেখছি টেবিলে। দেখা যাক কিছু লেখা আছে কিনা ওতে।'

টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। শহীদের অনুমানই ঠিক। কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে।

'হঠাৎ জরুরী একটা খবর পেয়ে আধঘণ্টার জন্যে বাইরে যাচ্ছি, দুঃখিত। ইতি, এমদাদুল হক।'

চিরকুটটা পড়া শেষ হতেই, চমকে উঠে ওরা দু'জন একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দরজার দিকে।

কিন্তু ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে। বাইরে থেকে কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। হুড়কো লাগিয়ে কড়ার তালায় চাবি ঢোকাচ্ছে কেউ, শব্দ শুনে বোঝা গেল।

তিন লাফে দরজার সামনে এসে গায়ের জোরে লাথি মারল শহীদ

দরজার কবাটে, কিন্তু সেগুন কাঠের কবাট তাতে এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না।

এদিক ওদিক তাকাতে টেবিলের কাছাকাছি জানালাটার উপর নজর পড়ল ওর।

'আয় দেখি, দু'জনে মিলে জানালাটা ভাঙা যায় কিনা!' বলে এগোল শহীদ।

দু'জনে মিলে জানালা ভাঙার চেষ্টা করছে, এমন সময় কাগজ ছেঁড়ার মত শব্দ ঢুকল কানে।

কান খাড়া করে রইল শহীদ। হাত দুটো স্থির হয়ে গেছে ওর। পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে। বিদ্যুৎবেগে পিছন দিকে তাকাল ও।

দেখল, পিছন দিকের দেয়ালের এক জায়গায় একটা ফুটো। ফুটোটা কাগজ দিয়ে ঢাকা ছিল। একটা মেশিনগানের নল সেই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে। চোখের পলকে কামালকে ধরে হেঁচকা টান মারল শহীদ, নিজেও পিছন দিকে লাফ দিয়ে দেয়ালের ধারে এসে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

প্রায় একই সময় গর্জে উঠল সাব-মেশিনগান।

মাথার উপর মেশিনগানের ব্যারেল। বিপরীত দিকের দেয়ালের প্রায় সবটা অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে শত শত বুলেটের আঘাতে।

মিনিট খানেক বুলেটের বৃষ্টি হলো। সাব-মেশিনগানের নলটা ফুটো দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে শহীদ হামাগুড়ি দিয়ে এগোল টেবিলের দিকে। ফিস ফিস করে বলল, 'আলোটা নেভাতে হবে।'

টেবিলের কাছে গিয়ে মাথা উঁচু করে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল শহীদ। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল প্রকাণ্ড হলঘরটাকে।

কামালের পাশে আবার ফিরে এল শহীদ হামাগুড়ি দিয়ে, 'এবার শত্রু দরজার দিক থেকে গুলি করতে পারে। চল্, দরজার দু'পাশে ওঁৎ পেতে থাকব দু'জন।'

অনুমানের উপর নির্ভর করে দরজার দিকে এগোল ওরা। শহীদ বলল, 'যখন গুলি হচ্ছিল, গুলির শব্দ ছাড়াও আর একটা শব্দ হচ্ছিল, শুনেছিস?'

কামাল চাপা কণ্ঠে বলল, 'শুনেছি। আশেপাশে বোধহয় লোহার কারখানা আছে। শব্দটা লোহা-পেটাবার বলে মনে হলো।'

বারুদের তীব্র কটু গন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। দরজার কাছে পৌঁছে নিঃশব্দে শুয়ে রইল ওরা। কিন্তু শত্রুর আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

মিনিট দশেক পর শহীদ বলল, 'ব্যর্থ আততায়ী চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কামাল, এ শত্রু আর যেই হোক, এমদাদুল হক নয়। আমাদেরকে খুন করে এমদাদের এমন কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া, পুলিস যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এমন লম্বা পরিকল্পনা করে কাউকে খুন করার কথা ভাবতে পারে না।'

কামাল বলল, 'আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু শহীদ, এখান থেকে বের হওয়ার উপায় কি?'

শহীদ বলল, 'সহজ উপায় আছে। গুলি করে দরজার তালা উড়িয়ে দিলেই হবে।'

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর যখন পরিষ্কার বুঝতে পারল শহীদ শত্রু সত্যি সত্যি অনুপস্থিত, রিভলভারের গুলি করে বাইরের তালা ভেঙে দরজা উন্মুক্ত করে ফেলল ও।

বাইরে বেরিয়ে কামালকে বলল, 'সবশেষের দোকান ঘরের ভিতর ঢুকতে চাই, আয়।'

ছোট দরজা দিয়ে দোকান ঘরটায় ঢুকে টর্চের আলোয় ওরা দেখল, মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটা হাতুড়ি এবং একটা ছেনি, দেয়াল ছিদ্র করার যন্ত্র হিসেবে। ঘরের ভিতর আর একটা উঁচু টুল ছাড়া কিছুই নেই।

'কি ব্যাপার! কি করছেন আপনারা ওখানে?' বাড়ির গেট থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

রিভলভার হাতে দোকানঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল একজন পুলিস কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে।

শহীদকে এবং কামালকে চিনতে পেরে সবিস্ময়ে কনস্টেবলটি বলল, 'স্যার, আপনারা এখানে? গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে এলাম এইমাত্র…।'

কামাল বলল, 'আমাদেরকে খুন করার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল।'

'সে কি! কে…?'

শহীদ জানতে চাইল, 'এ বাড়িটা কার বলতে পারো?'

'পরিত্যক্ত বাড়ি, স্যার। দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত। নিউ রি-কনস্ট্রাকশন স্কীমে এ বাড়ি ভেঙে ফেলার কথা। ভেঙে ফেলা হবে বলে এখানকার ভাড়াটেদের উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'এ বাড়ির পিছন দিকে একটা লোহার কারখানা আছে সম্ভবত, না?'

'জ্বী, স্যার। জেনুইন আয়রন, স্টীল অ্যান্ড মেশিনারীজ কোম্পানীর কারখানা।'

'রাতে কি কাজ হয় কারখানায়?'

'আগে হত।'

শহীদ জানতে চাইল, 'আজকাল হয় না বুঝি?'

'না।'

'কিন্তু আজ কাজ হয়েছে। যখন গুলি করা হয়েছে আমাদেরকে তার ঠিক আগে থেকে লোহা-পেটাবার কান ফাটানো শব্দ শুরু হয়। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গুলির শব্দ যাতে চাপা থাকে সেজন্যেই লোহা-পেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে আজ এই অসময়ে। চলো তো, কারখানাটা আমি একবার দেখব।'

'আসুন, স্যার। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

পুকুরঘাটা রোডের পিছন দিকে পৌঁছল ওরা।

কারখানাটি ছোটখাট। চারজন মিস্ত্রি কাজ করছিল।

শহীদ প্রশ্ন করল মিস্ত্রিদের হেডকে, 'রাতে কাজ করছ কেন?'

হেড উত্তরে বলল, 'অফিস থেকে জরুরী হুকুম হয়েছে, সাহেব। সকালেই সাপ্লাই দিতে হবে কিনা।'

'কে হুকুম দিয়ে গেছে?'

'ফারুক সাহেব।'

'হেড অফিসের কে তিনি?'

হেড মিস্ত্রি বলল, 'সুপারভাইজার, হুজুর।'

শহীদ হঠাৎ বলল, 'কাজও দিয়ে গেছে, সেই সাথে বেশ ভাল বকশিশের লোভও দেখিয়ে গেছে, না?'

'জ্বী, মানে, হ্যাঁ, বলেছেন সকালের মধ্যে কাজটা করে দিতে পারলে নাস্তার টাকা দেবেন।'

'ঠিক আছে, কাজ করো তোমরা।'

কারখানা ত্যাগ করে বেরিয়ে এল ওরা। খানিক দূর এসে শহীদ

বলল, 'আজহার মল্লিকের বাড়ির ভাড়াটের নামও ফারুক।'

'দু'জন মনে হচ্ছে একই লোক।'

শহীদ চিন্তিতভাবে বলল, 'তাই সন্দেহ হচ্ছে।'

চার

শহরের একধারে ডিভাইন ক্লাব। এমদাদুল হক পুলিসের ভয়ে এই ডিভাইন ক্লাবের দোতলার একটি কামরায় আত্মগোপন করে আছে। সঙ্গে আছে তার বন্ধু রকিব হোসেন।

এমদাদ জানে, তসলিমাকে একবার খবর দিলে হয়, অমনি ছুটে আসবে সে। মেয়েটা কেন যেন তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে মনপ্রাণ দিয়ে। তসলিমাকে খবর সে পাঠিয়েছে। রাত এখন দশটা। সাড়ে দশটার মধ্যে তাকে আশা করছে সে। শুধু খবরই পাঠায়নি সে, লোক মারফত একটা লেডিস কোটও পাঠিয়ে দিয়েছে উপহার স্বরূপ।

উপহার পাওয়া কোটটা গায়ে দিয়ে ঠিক সাড়ে দশটার সময়ই এল তসলিমা। কামরার দরজা বন্ধ করে পরামর্শ শুরু হলো ওদের। তসলিমার মান এবং সন্দেহ ভাঙাতে বেশ বেগ পেতে হলো এমদাদকে। তসলিমা জানতে চাইল, তার বাবার টাকার ব্যাগ এমদাদের গাড়ির ভিতর গেল কিভাবে?

এমদাদ ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করল। বলল, 'বিশ্বাস করো, গাড়িতে কোন ব্যাগ ছিল কিনা তাই আমি জানি না। তাছাড়া, তুমি ভাবতে পারলে কিভাবে তোমার বাবার টাকা আমি চুরি করব? আমি কি এতই নিচে নেমে গেছি?'

'ব্যাগটা তাহলে তোমার গাড়িতে গেল কিভাবে?'

এমদাদ বলল, 'নিশ্চয়ই আমাদের কোন শত্রুর ষড়যন্ত্র। তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি—এটাকে ধ্বংস করার জন্যে কেউ এই শত্রুতা করেছে।'

'কাকে সন্দেহ করো তুমি?'

এমদাদ বলল, 'তোমার প্রতি লোভ আছে এমন লোক তো আর কম নেই শহরে।'

তসলিমা থমথমে মুখ করে বসে রইল। এমন সময় দরজায় ঘনঘন করাঘাত করল কেউ বাইরে থেকে। পুলিস হানা দিয়েছে সন্দেহ করে এমদাদ লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল, ছুটল জানালার দিকে।

দেখতে দেখতে জানালার শার্সি খুলে উঠে পড়ল সে উপরে, লাফ দিয়ে পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে চলে গেল। সেখান থেকে ছুটল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল একটা চিলেকোঠার আড়ালে।

কামরার দরজা খুলে দিল রকিব। ইউনিফর্ম পরা ইন্সপেক্টর হায়দার আলী দৃঢ় পায়ে ঢুকল কামরার ভিতর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে তসলিমার দিকে তাকাল সে, 'তুমি! তসলিমা, তুমি এখানে কেন?'

তসলিমা বলল, 'কেন, তাতে তোমার কি?'

হায়দার বলল, 'ছিঃ তসলিমা, এতটা নিচে নামা কি তোমার মত মেয়ের উচিত? তোমাকে আমি চিনি। জানি, কিরকম পরিবারের মেয়ে তুমি…।'

'কেন এসেছ? উপদেশ খয়রাত করতে বুঝি?'

হায়দার আলী বলল, 'না। তোমাকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি! আমি এসেছি এমদাদের সন্ধানে। কোথায় সে?'

'আমার কোটের পকেটে। খুঁজে দেখো, পাবে।'

হায়দার আলী কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রকিবের দিকে, 'আপনি বলুন, কোথায় এমদাদ? আমি জানি, এখানে ছিল সে। খবর পেয়েই আমরা এসেছি।'

'ও কিছু জানে না। আমাকে জিজ্ঞেস করো। এমদাদ এখানে আসবে, কথা আছে। এখনও আসেনি। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করছি। দরকার মনে করলে তুমিও অপেক্ষা করতে পারো।'

হায়দার আলী বলল, 'তসলিমা, সত্যি তুমি অনেক নিচে নেমে গেছ। আমি জানি, এমদাদ একটু আগেও এই কামরায় ছিল···।'

তসলিমা জোর গলায় বলল, 'আমি বলছি ছিল না। আর—শোনো হায়দার, বারবার নিচে নেমে গেছ, নিচে নেমে গেছ বলবে না তুমি আমাকে, সাবধান করে দিচ্ছি আমি! পুলিস অফিসার হয়েছ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছ নাকি?'

হায়দার আলী হাসল। সে-হাসি ম্লান, তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বলল, 'তসলিমা, তুমি আমাকে দেখলেই অকারণে রেগে যাও। এটা কি উচিত? আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমি চাই না তোমার অধঃপতন ঘটুক···।'

'সব্বোনাশ! আবার তুমি আদর্শের-বুলি ছাড়তে শুরু করলে?' তসলিমা অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাল।

অপমান বোধ করল সম্ভবত এবার হায়দার আলী। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, বলল, 'বেশ। চললাম আমি। তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই।'

ক্লাবের নিচতলায় নেমে গেল ইন্সপেক্টর হায়দার আলী। তার সাথে সাব-ইন্সপেক্টর আবদুর রউফ এবং কয়েকজন রাইফেলধারী কনস্টেবল

এসেছিল, তাদেরকে রেখেই সে চলে গেল থানায়।

চক্রবর্তী লেনের চব্বিশ নম্বর বাড়িতে এখন ভাড়া থাকেন লঞ্চ কোম্পানীর সুপারভাইজার আকরাম হোসেন চাকলাদার, কিন্তু বছর দেড়েক আগে ওই চব্বিশ নম্বর বাড়িতে ভাড়া থাকত হায়দার আলী। হায়দার আলী সৎ, ভদ্র যুবক। তখন সে সাব-ইন্সপেক্টর ছিল। পাশের বাড়ির তসলিমাকে সে মনে মনে ভালবাসত সেই তখন থেকেই। কিন্তু তসলিমা ঠোঁট-কাটা চঞ্চলা প্রকৃতির মেয়ে বলে পরিষ্কার ভাষায় হায়দার আলী কোনদিনই বলতে পারেনি তার ভালবাসার কথা। প্রায়ই সে তমলিমাদের বাড়িতে যেত, গল্প করতে। তসলিমার ছটফটে স্বভাবটাই আসলে আকৃষ্ট করত তাকে। কিন্তু হায়দারকে তসলিমা বিশেষ পাত্তা কোনদিনই দেয়নি। বাঁকা চোখে দেখত তাকে, বাঁকা বাঁকা কথা বলত। হায়দার আলী মনে মনে আশা পোষণ করত, একদিন না একদিন তার অন্তরের গভীব প্রেমের কথা হৃদয়ঙ্গম করবে তসলিমা, তার ভালবাসার যথোপযুক্ত মূল্য দেবে।

কিন্তু তা ঘটেনি। দিনে দিনে আরও দূরে সরে গেছে তসলিমা। যার তার সাথে মেলামেশা, রাত গভীর করে বাড়ি ফেরা, দায়িত্বজ্ঞানহীনার মত আচরণ—তসলিমা ক্রমশ যে দূরে সরে যাচ্ছিল তাই নয়, নষ্ট হয়েও যাচ্ছিল সে।

হায়দার আলী বহু চেষ্টা করেছে তসলিমাকে বোঝাতে। যেচে পড়ে ডেকে পাঠিয়ে উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু তসলিমা তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি এতটুকু। তসলিমাকে ফেরানো সম্ভব না আর, ধরেই নিয়েছিল হায়দার আলী। কিন্তু তসলিমার প্রতি তার যে দুর্বলতা, তা আজও সে অনুভব করে। আজও সে গভীরভাবে ভালবাসে তসলিমাকে।

হায়দার আলী নিচে নেমে যেতে রকিব বলল, 'ইন্সপেক্টরের সাথে

অমন ব্যবহার করলেন, কাজটা কি ভাল হলো?'

তসলিমা বলল, 'থামুন আপনি! ওকে আমি চিনি, আমার একটা মিষ্টি কথার জন্যে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বাজি রাখতে পারে ও। ইন্সপেক্টর হলে হবে কি, মেয়েদের মত নরম স্বভাব ওর।'

রকিব বলল, 'এখন আর এখানে বসে থেকে লাভ কি! চলুন, আমার বাড়িতে যাই। রাতটা আমার ওখানেই কাটাবেন।'

'কী?'

রকিব ঢোক গিলে বলল, 'না···মানে, এত রাতে বাড়ি ফেরার চাইতে···।'

'আপনি দেখছি আস্ত একটা ছোট লোক! এরকম একটা কথা মুখ দিয়ে বের করলেন কিভাবে? দাঁড়ান, দেখা হোক এমদাদের সাথে, বলব'খন।' বলে উঠে দাঁড়াল তসলিমা।

রকিব হাসল। বলল, 'এমদাদ কি করবে আমার? ওর এমন সব দুর্বলতার কথা আমি জানি যে···।'

'কি দুর্বলতার কথা জানেন আপনি তার?'

রকিব সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আজ নয়, আর এক দিন বলব। তা, চললেন নাকি?'

তসলিমা তাচ্ছিল্যভরে অন্য দিকে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, জুতোর খট্ খট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে পড়ল কামরা থেকে।

নিচের হলঘরে সাব-ইন্সপেক্টর ক্লাবের সেক্রেটারি এবং সদস্যদের জেরা করছিল। তসলিমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখল সে।

হলঘরে নেমে তসলিমা কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সাব-ইন্সপেক্টর পিছন থেকে ডাকল, 'এই যে মিস, শুনুন!'

তসলিমা দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আমাকে ডাকছেন?'

সাব-ইন্সপেক্টর তসলিমার মুখের দিকে নয়, তসলিমার পরনের দামি কোটটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল, বলল, 'হ্যাঁ, এদিকে আসুন তো, আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

তসলিমা ফিরে এল।

'বসুন।' একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল আবদুর রউফ। সেক্রেটারি এবং অন্যান্যরা তসলিমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আপনি কি এই ক্লাবের মেম্বার?'

তসলিমা বলল, 'না।'

'কারও সাথে এসেছেন তাহলে?'

তসলিমা বলল, 'না। একজনের আসার কথা ছিল এখানে, তার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। সে আসেনি।'

'তার পরিচয়টা বলবেন?'

'না, বলতে চাই না।'

আবদুর রউফ কিছু যেন চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আপনাকে আসলে ডাকলাম অন্য একটা কারণে। কিছু যদি মনে না করেন, আপনার গায়ের কোটটা একবার খুলবেন?'

তসলিমা সাব-ইন্সপেক্টর আবদুর রউফের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, 'তার মানে?'

'কোটটা আমি দেখতে চাই।'

তসলিমা, 'কেন? দেখার কি আছে আমার কোটে?'

আবদুর রউফ বলল, 'বলুন তো, কোটটা কোত্থেকে পেয়েছেন? নাকি কিনেছেন কোন দোকান থেকে?'

তসলিমা বলল, 'না, কিনিনি। আমার এক বন্ধু আমাকে উপহার

দিয়েছেন এটা। কেন?'

'বন্ধুর পরিচয়?'

'দিতে চাই না।'

আবদুর রউফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আপনার পরিচয়?'

'তসলিমা মল্লিক, গ্ল্যাডস্টোনে চাকরি করি।'

আবদুর রউফ বলল, 'মিস তসলিমা, আপনাকে আমার সাথে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে।'

'থানায় যেতে হবে! কেন?'

তসলিমা নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেনি।

আবদুর রউফ বলল, 'গত হপ্তায় মতিঝিলের সুদর্শন রেডিমেড গার্মেন্টস-এর দোকানে চুরি হয়েছে, চোরেরা দোকানের তালা ভেঙে প্রায় দু'লক্ষ টাকার কাপড়-চোপড় নিয়ে গেছে। দোকানে কিছু দামি কোটও ছিল। আমার ধারণা, আপনার এই কোটটা ওই দোকানের চুরি যাওয়া কোটগুলোর একটা।'

'এরকম অযৌক্তিক ধারণার কারণ কি আপনার?' তসলিমা জানতে চাইল।

'অযৌক্তিক নয়। আপনার গায়ে যে কোট দেখছি এরকম কোট একমাত্র সুদর্শন রেডিমেড গার্মেন্টস-ই বিক্রি করে। এবং, এ বছর এ ধরনের কোট তারা বিক্রি করেনি একটাও। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই চুরির মাল। চলুন, থানায় গিয়ে জবানবন্দী দিতে হবে আপনাকে।'

তসলিমা বিপদের গুরুত্ব অনুধাবনে সমর্থ হলেও, করার কিছু ছিল না তার। সাব-ইন্সপেক্টরকে সে বোঝাতে চেষ্টা করল অনেকভাবে, কিন্তু কাজ হলো না। থানায় গেলে মান-সম্মান তো যাবেই, কোটটা যদি সত্যি চোরাই মাল হয়ে থাকে, তাহলে হাজতে আটকে রাখবে তাকে, পরে

কোর্টে বিচার হবে তার, জেল-জরিমানা হবে—ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেলল তসলিমা।

তার কান্না দেখে আবদুর রউফের মন গলল। কিন্তু একটুমাত্র। সে বলল, 'এই ক্লাবের কেউ যদি আপনার জামিন হন, তাহলে শুধু কোটটা আপনার কাছ থেকে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারি আপনাকে। তবে কাল সকালেই থানায় হাজির হতে হবে।'

কিন্তু ক্লাবের কেউ তসলিমাকে চেনেই না। তারা নিজেরাই ঝামেলায় আছে, তার উপর অপরিচিতা একটা মেয়ের জামিন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, উপায় রইল না। তসলিমাকে পুলিসের জীপে চড়ে যেতে হলো থানায়।

তসলিমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, থানায় হায়দার আলীকে পাবে সে, তার সহায়তায় এই বিপদ থেকে এ যাত্রা মুক্ত হতে পারবে। কিন্তু থানায় পৌঁছে দেখল, ইন্সপেক্টর হায়দার অনুপস্থিত।

কোটটা খুলে দিতে হলো তসলিমাকে। তার সামনেই পরীক্ষা করা হলো সেটাকে। প্রমাণ হলো, এটা চোরাই মাল। অপ্রত্যাশিত বিপদ আরও একটা ঘাড়ে এসে পড়ল। কোটের ভেতরের পকেটগুলো সার্চ করার সময় একটা জড়োয়া সেট বেরিয়ে পড়ল। অত্যন্ত মূল্যবান, প্রায় হাজার দশেক টাকা তো হবেই। হৈ হৈ পড়ে গেল থানায়।

সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, 'রমনা ভবনের সুবর্ণ জুয়েলারী থেকে এই জড়োয়া সেট চুরি হয়েছে কিছুদিন আগে।'

ভরাডুবির আর বাকি রইল না। তসলিমাকে কড়া পাহারায় পাঠিয়ে দেয়া হলো ভিতরের সেলে। আবদুর রউফ তার বিরুদ্ধে ডায়েরীতে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে বসল।

আধঘন্টা পর অফিসে ডাক পড়ল আবার তসলিমার।

অফিসে এসে বসল তসলিমা। আবদুর রউফ তাকে জেরা করার জন্যে ডেকেছে।

নাম, ঠিকানা, পরিচয় ইত্যাদি জেনে নিয়ে আবদুর রউফ প্রশ্ন করল, 'কোটটা কে আপনাকে দিয়েছে, এবার বলুন।'

'নাম বলতে পারব না।'

'নিজের এতবড় বিপদ জেনেও?'

তসলিমা চুপ করে রইল। এমন সময় হায়দার আলী ঢুকল অফিসে। তসলিমাকে দেখে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল সে।

সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আবদুর রউফ গড়গড় করে বলে ফেলল সব। তার কথা শেষ হতেই ধমক মারল হায়দার আলী কঠিন কণ্ঠে, 'তুমি একটা বোকা, রউফ। একজন ভদ্রমহিলাকে এভাবে অপমানিত করা কি উচিত হলো?'

'কি...কি বলছেন আপনি?'

হায়দার চেয়ার দখল করে বসল। বলল, 'ঠিকই বলছি! ক্লাবের উপরের একটা কামরায় এই কোটটা পাই আমি। এটা ফেলে রেখে এমদাদ জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি কোটটা এই ভদ্রমহিলার হাতে দেই রাখার জন্যে। তখন আমি এমদাদকে ধাওয়া করে ধরা সম্ভব কিনা বিবেচনা করছিলাম জানালার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ভুলে গিয়ে কোটটা না নিয়েই নেমে আসি নিচে...।'

আবদুর রউফ কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'ছি-ছিঃ। কিন্তু মিস তসলিমা যদি এসব কথা আমাকে বলতেন...।'

'কেন বলবেন উনি? দোষ ওর নয়, আমার। আমার উচিত ছিল কথাটা তোমাকে জানিয়ে আসা।'

আবদুর রউফ তসলিমার দিকে তাকাল লজ্জিতভাবে, 'মিস

তসলিমা, আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, আমি সারাক্ষণ ভাবছিলাম, এ ধরনের জঘন্য চৌর্যবৃত্তির সাথে আপনার মত একজন ভদ্রমহিলা জড়িত থাকতে পারেন না…।'

তসলিমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল, এখন কি আমি যেতে পারি?'

হায়দার বলল, 'রাত তো অনেক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, পৌঁছে দেব আমি গাড়ি করে।'

দু'জন এক সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। জীপে চড়ে বসল তসলিমা। হায়দার ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। স্টার্ট দিয়ে জীপ ছেড়ে দিল সে।

কারও মুখে কোন কথা নেই। তসলিমার মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। হায়দারকে যেন সে আজ নতুন করে চিনেছে। লোকটার মধ্যে অদ্ভুত একটা গুণ আছে, যা বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে থাকে না, হঠাৎ আজ আবিষ্কার করল তসলিমা ব্যাপারটা।

এমদাদের কথাও বারবার মনে পড়ছিল তসলিমার। এমদাদ এবং হায়দার দু'জনই মানুষ, কিন্তু দু'জনের মধ্যে কি রকম আকাশ পাতাল প্রভেদ!

একটা সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো তসলিমার মনে। এর-তার মুখে সে শুনেছে, এমদাদ ভাড়াটে ডাকাতদেরকে নিযুক্ত করে দোকানপাটের মালামাল লুট করার জন্যে। সেই চোরাই মালামাল বিক্রি করে দেয় সে নাম মাত্র মূল্যে। তাতে তার ভাল রোজগার হয়। রোজগারের সব টাকা সে মদ খেয়ে, জুয়া খেলে ওড়ায়।

কথাগুলো এতদিন শুনেই এসেছে তসলিমা, বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আজ আর অবিশ্বাসের কিছু রইল না।

নিজেকে প্রশ্ন করল তসলিমা, তবে কি বাবার টাকাও এমদাদ…?

পাঁচ

চব্বিশ নম্বর বাড়ির ভাড়াটে লঞ্চ কোম্পানীর সুপারভাইজার আকরাম হোসেন চাকলাদার মদ খেয়ে টং মাতাল অবস্থায় বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল। রাত তখন গভীর।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দু'খানা পাঁচ টাকার নোট মনে করে দু'খানা দশ টাকার নোট দিয়ে টলতে টলতে গেট অতিক্রম করে বাড়ির ভিতর ঢুকল সে। গেটটা বন্ধ থাকারই কথা। কিন্তু খোলা দেখেও সে ব্যাপারে মাথাব্যথা দেখা গেল না তার।

ঝোপ-ঝাড় এবং আগাছায় ভর্তি উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল সে। পকেট হাতড়ে চাবি বের করল। তালার ছিদ্রে চাবি ঢোকাতেই পিছন থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ, কাকা! গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম ওই ঝোপে, মশায় খেয়ে ফেলেছে একেবারে!'

গলার স্বর শুনে আকরাম হোসেন চিনতে পারল লোকটাকে।

'এমদাদ! তুই এত রাতে কোত্থেকেরে, অ্যাঁ?'

'দরজা খোলো তাড়াতাড়ি! কেউ দেখে ফেললেই সর্বনাশ। পুলিসের দল আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

আকরাম হোসেন তালা না খুলে ঘুরে দাঁড়াল। 'তাই নাকি? তাতে আমার কি? তোকে পুলিস ধরবে, তুই জেল খাটবি—আমার তাতে কি ক্ষতি, অ্যাঁ?'

এমদাদ বলল, 'মাতালদের নিয়ে এই আর এক বিপদ! বলছি না, কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে? দরজাটা খোলো...!'

'অ্যাঁই! হুকুমের সুরে কথা বলবি না, বলে দিচ্ছি এমদাদ। ভাল হবে না তাহলে কিন্তু!'

মাতাল প্রৌঢ় আকরাম হোসেন চাকলাদার টলতে টলতে শাসিয়ে দিল এমদাদকে।

'আচ্ছা, আচ্ছা! দাও, চাবিটা না হয় আমাকেই দাও...।'

চাবি নিয়ে এমদাদ হলঘরের দরজা খুলল। আকরাম হোসেনকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। তারপর ভিতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা।

আকরাম হোসেন সোফায় বসে পড়ল সশব্দে। বলল, 'যা ভাগ এখন! আমাকে একটু আরাম করতে দে।'

'সে কি! বললাম না, পুলিস আমাকে খুঁজছে! আমি তো গা ঢাকা দিয়ে এখানে থাকব বলেই এসেছি, কাকা।'

'তাতে আমার কি লাভ?'

এমদাদ বলল, 'ওহ্, লাভ লোকসানের কথা ভাবছ? দেখো কাকা, তোমার মাধ্যমে আমি মাল বিক্রি করে যে ঠকা ঠকছি—আর কেউ হলে...।'

'কি! আমি তোকে ঠকাচ্ছি?'

এমদাদ বলল, 'ঠকাচ্ছ না? দশ টাকার মাল এক টাকায় বেচছি—একে ঠকা বলে না তো কাকে বলে?'

'চোরাই মাল এর চেয়ে বেশি দাম কে দেবে রে?'

'পার্টিরাই দেবে। তুমি যদি এতই সাধু, দাও না পার্টির সাথে সরাসরি আমার পরিচয় করিয়ে?'

আকরাম হোসেন মাতাল হলেও, স্বার্থবুদ্ধি হারায়নি। এমদাদের কথা শুনে হাসল সে। বলল, 'উঁহুঁ! সেটি হবে না। মাল বিক্রি করতে হলে আমার মাধ্যমেই করতে হবে। ধরে নে, আমিই তোর পার্টি।'

এমদাদ বলল, 'সে যাক। দালালি করে অনেক টাকা খেয়েছ আমার। এখন এই বিপদে ক'দিন গা ঢাকার জন্যে আশ্রয় দাও আমাকে।'

আকরাম বলল, 'আচ্ছা, তা না হয় হলো। কিন্তু মাল আবার কবে দিচ্ছিস তাই বল?'

'কিছুদিন মাল দিতে পারব না। পুলিস খেপে আছে বড্ড। খুব সাবধানে, রয়ে সয়ে কাজে হাত দিতে হবে।'

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

'পুলিস!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এমদাদ। এদিক ওদিক তাকিয়ে বড় একটা আলমারি দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তার আড়ালে গা ঢাকা দিল।

'কে?'

সোফা ত্যাগ করে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল আকরাম।

বাইরে থেকে জবাব এল, 'দরজা খোলো, চাকলাদার। আমি জাহাঙ্গীর হোসেন

'ওহ্। জাহাঙ্গীর সাহেব!'

দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল আকরাম। হলঘরে ঢুকল চক্রবর্তী লেনের ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির জাহাঙ্গীর হোসেন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে আকরাম বলল, 'বসুন। এত রাতে কি মনে করে, জাহাঙ্গীর সাহেব? জরুরী কোন খবর আছে নাকি?'

জাহাঙ্গীর বলল, 'তুমি আবার মাতাল হয়েছ?'

'না না! মাতাল হয়েছি কে বলল, সামান্য একটু গলায় ঢেলেছি আর কি!'

জাহাঙ্গীর সোফায় বসে দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করল পকেট থেকে। আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিংয়ের দিকে। বলল, 'লঞ্চে মাল তোলা হয়েছে সব?'

'হয়েছে, জাহাঙ্গীর সাহেব। সে-ব্যাপারে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

জাহাঙ্গীর বলল, 'আর কতটা জায়গা খালি আছে?'

'আছে, খুব বেশি নয়। টন তিনেক তোলা যায় আরও।'

'লঞ্চটায় কেবিন যেন ক'টা?'

'তিনটে। কেন বলুন তো?'

জাহাঙ্গীর বলল, 'আচ্ছা, আকরাম, তোমার এই লঞ্চ কি সাগরের তীর ঘেঁষে দূর কোন বন্দরে যেতে পারবে?'

'বলেন কি! এটা তো নামে লঞ্চ, আসলে স্টীমারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কোলকাতায় তো এই লঞ্চ অমন একশোবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু এসব প্রশ্ন···।'

জাহাঙ্গীর বলল, 'এবার আমরা টেকনাফে মাল বিক্রি করব না, আকরাম। আরও দূরে কোথাও যাবার কথা ভাবছি আমি। তাতে মালের দাম অনেক বেশি পাব।'

'খুব ভাল কথা।'

জাহাঙ্গীর বলল, 'তাছাড়া, আমাদের প্রতিবেশী আজহার সাহেব এবং আরও দু'একজনের হাওয়া পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমার মাল বিক্রি এবং ওদের হাওয়া পরিবর্তন, একসাথে দুটো কাজই করতে চাই।'

'হুকুম দিলেই নোঙর তুলব, জাহাঙ্গীর সাহেব।'

জাহাঙ্গীর সিগারেট টানতে টানতে উঠে দাঁড়াল, 'ভাল কথা, তেমন বিশ্বস্ত লোক আছে তোমার হাতে?'

'কেন বলুন তো?'

জাহাঙ্গীর বলল, 'বিশ্বস্ত এবং সাহসী হওয়া চাই লোকটার। অচেনা বন্দরে নামব, একজন দেহরক্ষী ধরনের লোক দরকার।'

'নিশ্চয়ই দরকার! সেরকম লোক আমার হাতেই আছে, আপনি ভাববেন না।'

'ঠিক আছে। চললাম। তৈরি হয়ে থেকো, বললেই যেন রওনা হতে পারো।'

জাহাঙ্গীর হোসেন চলে যেতেই এমদাদ বেরিয়ে এল আলমারির আড়াল থেকে।

'কাকা!'

'আহ্, আবার কেন বিরক্ত করিস?'

এমদাদ বলল, 'আমি যাব।'

'যাবি! কোথায় যাবি?'

'ওই যে, ভদ্রলোক বললেন, তাঁর দেহরক্ষী দরকার···।'

'ওহ্। যাবি নাকি? তা···বেশ, যাবি। কিন্তু এমদাদ, বুঝতেই তো পারছিস, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার ওপর নির্ভর করছে। এখন, আমাকে যদি তুই সন্তুষ্ট করতে পারিস।'

'কি দিতে হবে বলো?'

আকরাম হোসেন হাসতে লাগল। বলল, 'বিশেষ কিছু না। এক ডজন জনিওয়াকারের বোতল।'

'পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে হলে দেশ ছেড়ে কিছু দিন বাইরে

থাকা দরকার আমার—ঠিক আছে, পাবে তুমি এক ডজন জনিওয়াকার।' রাজি হয়ে গেল এমদাদ। তারপর, হঠাৎ সে বলল, 'কাকা, কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'ন্যাকামি না করে···।'

'ওই ভদ্রলোকই আমার মাল কেনেন, না?'

আকরাম হোসেন খেপে গেল, 'না! অসম্ভব! কে বলল তোকে?'

এমদাদ বলল, 'নিজের কানেই তো শুনলাম···।'

'না হয় কেনেই, তাতে তোর কি? তুই আমার কাছে বিক্রি করিস, আমি জাহাঙ্গীর সাহেবের লোক—বুঝলি কিছু?'

'তার মানে ব্যবসায় তোমরা অংশীদার?'

আকরাম হোসেন বলল, 'সন্দেহ হয় নাকি? শুনলি না, লঞ্চটা আমার? ওই লঞ্চ যদি ম্যানেজ না করতে পারতাম, ব্যবসা হত?'

এমদাদ বলল, 'আমি তো স্রেফ চুরি করি, আর তোমরা চোরাকারবার করো। আমি ধরা পড়লে ক'মাসের জেল হবে, তোমরা ধরা পড়লে হয় যাবজ্জীবন, নয় মৃত্যুদণ্ড!'

'বাজে কথা বলবি না, এমদাদ। ধরা পড়ব কেন, অ্যাঁ? ধরা পড়লে তুই-ই পড়বি। চুনোপুঁটিরাই সবসময় ধরা পড়ে, রুই কাতলারা চিরকাল গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এমদাদ বলল, 'ঠিকই বলেছ, কাকা।'

ছয়

পুকুরঘাটা রোডে অদৃশ্য আততায়ীকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাড়ি ফিরে শহীদ

এবং কামাল ডাইনিংরুমে খেতে বসল।

খেতে খেতে কামাল বলল, 'আজহার মল্লিক ভদ্রলোককে আমি দেখিনি। তিনি কেমন মানুষ জানি না। মানুষ যেমনই হোন, টাকার লোভে যদি তিনি দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের ছেলে শামিমকে খুন করে থাকেন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমি ভাবছি, ফারুক চৌধুরী নামে তার ওই অবিবাহিত ভাড়াটেকে সব কিছুতে সবার আগে দেখা যাচ্ছে কেন? বাড়িতে খুন হলো শামিম, লাশ বাইরে ফেলে দিয়ে আসার প্রস্তাব এল তার কাছ থেকে। এদিকে, তোকে খুন করার ফাঁদ পাতা হলো আজ, খোঁজ নিতেই জানা গেল, সে-ও রয়েছে এর মধ্যে।'

শহীদ বলল, 'কথাটা আমিও ভাবছি। লোকটার আচরণ খুবই সন্দেহজনক। নিজের অনিষ্ট করে অপরের ভাল করার ব্যাপারে সে যেন একপায়ে খাড়া হয়ে আছে। আরও একটা ব্যাপার!'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কামাল শহীদের দিকে।

'সেই লোকটা, যে ডি. কস্টাকে শূন্যে তুলে ডোবার পানিতে ফেলে দিয়েছিল—কে সে? তার ভূমিকা কি এই নাটকে? আজহার মল্লিকের বাড়িতে পুরুষ মাত্র দু'জন। তিনি এবং ফারুক চৌধুরী। দু'জনেই সে-সময় শামিমের লাশ নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের রাস্তার সে লোকটা তাহলে কে? তার কি স্বার্থ? লাশটা নিয়ে বাড়ি থেকে আজহার মল্লিক এবং ফারুক চৌধুরী বের হবে, ডি. কস্টা দেখে ফেলবে—লোকটা চায়নি তা। কেন? আমার কি মনে হচ্ছে জানিস, কামাল?'

'কি?'

'পঁচিশ নম্বর বাড়িতে এই রহস্যের সমাধান নেই। আর রহস্যময় সেই লোকটা—সেই হয়তো এই নাটকের মূল চরিত্র, আসল নায়ক।'

কামাল বলল, 'ঠিক কি বলতে চাইছিস তুই?'

'ভেবে দেখ, শামিমের খুনের ব্যাপারটা বাইরের কোন লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অথচ, ঘটনাক্ষেত্রে কি দেখা গেল? দেখা গেল, বাইরে থেকেও একজন লোক খুনের কথাটা জানে। শুধু জানে তাই নয়, সে পঁচিশ নম্বর বাড়ির লোকদের মান সম্মান এবং নিরাপত্তা যাতে বিনষ্ট না হয় তার জন্যে যা করা প্রয়োজন সব করতে তৈরি হয়ে আছে। এই লোককেই দরকার আমাদের। একে পেলেই এই কেসের সমাধান পাওয়া যাবে।'

কামাল বলল, 'কিন্তু অন্য দিক থেকে চিন্তা করে দেখ, ধাঁধা আরও আছে।'

শহীদ বলল, 'জানি। যেমন, আজহার মল্লিকের অফিসে ফোন করে আমি জেনেছি, দশ হাজার টাকাই তিনি জমা দিয়েছেন আজ সকালে অফিসে।'

'কোত্থেকে পেলেন তিনি অত টাকা? শামিমকে খুন করে আট হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন, বাকি দুই হাজার টাকা—ধার করেছেন সম্ভবত কারও কাছ থেকে।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু শামিমের কাছে যে টাকা ছিল—প্রমাণ কি? মিস আতিয়া মিথ্যে কথা বলে থাকতে পারে। শামিম যে হাউজী খেলে টাকা জেতেনি, এ তো আমরা জেনেছিই।'

'তাহলে?'

শহীদ বলল, 'শামিমের কাছে টাকা ছিল কিনা সেটাই একটা প্রশ্ন। টাকা থাকলে, ধরে নিতে হবে, অবৈধ কোন উপায়ে সে তা পেয়েছিল কারও কাছ থেকে।'

কামাল মুখ বিকৃত করে বলল, 'গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি!'

শহীদ বলল, 'পঁচিশ নম্বর বাড়ির চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দে। গোলকধাঁধা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ডিনার শেষ করে ড্রয়িংরুমে এসে বসল ওরা। কামাল সিগারেট ধরাল। শহীদ পাইপে অগ্নিসংযোগ করল।

মহুয়া লাল কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়িয়ে ভিতরে ঢুকল। বলল, 'এই শীতে আবার বাইরে কোথাও যাবে নাকি তোমরা?'

'না।' কামাল বলল।

শহীদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওকে বাধা দিয়ে ফোনের বেল ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল।

'কে হতে পারে?' কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল কামাল।

শহীদ ইতোমধ্যে রিসিভার তুলে নিয়েছে। 'শহীদ খান স্পিকিং!'

সেই পরিচিত, ভারি কণ্ঠস্বর, 'শহীদ, লোকটার সন্ধান পেয়েছি। ডি. কস্টা ভুল করেছিলেন। অবশ্য দোষ পুরোপুরি তাঁর নয়। আমি যাকে অনুসরণ করতে বলেছিলাম, তিনি তাকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু লোকটা সোজা নিজের বাড়িতে না ঢুকে ঢুকেছিল তার পাশের বাড়িতে, প্রতিবেশীর ভাল মন্দ খবর সংগ্রহের জন্যে।'

'তার মানে লোকটা পঁচিশ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা নয়, ছাব্বিশ নম্বরের বাসিন্দা, এই তো?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ।'

শহীদ হেসে ফেলল, 'বুঝেছি। লোকটার নাম জাহাঙ্গীর হোসেন। আচ্ছা, ওকে তোমার সন্দেহ করার কারণ কি, বলো তো? ও-পাড়ায় খুব সুনাম ওর। পরোপকারী, নিঃস্বার্থ, মিশুক—ইত্যাদি প্রশংসা শুনেছি ওর

নামে।'

'সন্দেহ ঠিক করি না। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ প্রথম দেখি, তার আগে কখনও দেখিওনি। কি জানো, লোকটাকে দেখেই কেমন যেন ছ্যাঁত্ করে উঠেছিল বুকের ভিতর। এমন তো সাধারণত হয় না। ওর সম্পর্কে কিছু না জানলেও, কেন যেন দেখা মাত্র মনে হয়েছিল, এই লোককে বিশ্বাস করা যায় না, এ লোক পারে না এমন কাজ নেই।'

শহীদ বলল, 'লোকটাকে দেখে আমারও অবশ্য অনেক কথা মনে হয়েছিল। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি নজর রাখছি ওর ওপর।'

কুয়াশা বলল, 'শোনো, লোকটা এখন একটা ক্লাবে ঢুকে বীয়ার খাচ্ছে। গাড়িটা বাইরে, বিকল করে দিয়েছি আমি। তুমি এই সুযোগে ওর বাড়িটা একবার সার্চ করে দেখতে পারো। হয়তো তেমন কিছু পাবে না, তবু···।'

শহীদ উৎসাহভরে বলল, 'এক্ষুণি যাচ্ছি আমরা।'

'কতক্ষণ সময় পাবে জানি না। তাড়াতাড়ি কাজ সারার চেষ্টা কোরো। হাতে আমার সময় নেই, তা না হলে ওকে দেরি করিয়ে দেবার জন্যে ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম।'

শহীদ বলল, 'কোন দরকার নেই। আমরা এখুনি রওনা হয়ে যাচ্ছি, পনেরো মিনিট সময় পেলেই কাজ সারতে পারব।'

রিসিভার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ।

মহুয়া শুকনো মুখে বলল, 'দাদাও দেখি তোমাদেরকে বাড়ির বাইরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আজকাল!'

কামাল অবাক হয়ে বলল, 'আজ নতুন নাকি! আগে বাইরে বেরোতাম ওর পিছু ধাওয়া করার জন্যে—এই যা!'

শহীদ বলল, 'ভবিষ্যতেও ওই একই কারণে আমাদেরকে বাড়ির

বাইরে বেরুতে হবে আবার, এই আমি বলে রাখলাম! ওর নাম কুয়াশা, কখন কি আবিষ্কার করার জন্যে কি না কি ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটাতে শুরু করবে—আগে থেকে বলা মুশকিল।'

চক্রবর্তী লেনের মুখে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল শহীদ এবং কামাল। পায়ে হেঁটে গলির ভিতর ঢুকল।

রাত সাড়ে এগারোটার মত বাজে। গলিপথ নির্জন, কুয়াশায় ঢাকা। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে পঁচিশ নম্বর বাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির গেট খোলা, হা হা করছে। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় গেট খোলা রেখে গেছে জাহাঙ্গীর হোসেন।

বাড়ির ভিতর ঢুকল ওরা। উঠানের এখানে সেখানে বড় বড় গাছ দেখা যাচ্ছে।

শহীদ নিচু গলায় বলল, 'কামাল, পাহারায় থাক তুই। কেউ এলে সিগন্যাল দিবি।'

'তথাস্তু!'

উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল শহীদ। আলো জ্বলছে। দেয়ালের গায়ে সুইচ বোর্ড, তাতে লাল একটা বোতাম। কলিংবেলের বোতাম ওটা। শহীদ চেপে ধরল আঙুল দিয়ে।

অন্দর মহলে বেল বাজছে। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ সাড়া দিল না দেখে শহীদ বুঝতে পারল, বাড়ি শূন্য, কেউ নেই।

নিশ্চিত হয়ে সামনের জানালা দরজাগুলো পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শহীদ। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না বলে উঠানে নেমে বাঁ দিক দিয়ে চলে এল বাড়ির পিছন দিকে।

পিছন দিকে একটা জানালা খোলা ছিল। কিন্তু গরাদ লাগানো।

লোহার শিক ধরে গায়ের জোরে টানাটানি করতে বাঁকা হয়ে গেল দুটো শিক দু'দিকে। শহীদ ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকল।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে সেখান থেকে কিচেনে গেল শহীদ। তারপর ড্রয়িংরুমে দেখল, বাংলাদেশের প্রকাণ্ড একটা মানচিত্র টাঙানো রয়েছে। টেকনাফ, চালনা ইত্যাদি জায়গায় বারবার হাত পড়ায় কালো দাগ পড়ে গেছে, লক্ষ করল শহীদ।

কোথাও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না। আসবাবপত্র দেখে শহীদ শুধু বুঝতে পারল, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রচুর টাকার মানুষ। কম দামী কোন জিনিসই সে ব্যবহার করে না। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করল শহীদ, জাহাঙ্গীর হোসেনের সব ব্যবহার্য জিনিসপত্রই একেবারে আনকোরা নতুন। পুরানো জিনিস বলতে তার কিছুই নেই। ব্যাপারটা লক্ষ করে রীতিমত আশ্চর্যই হলো শহীদ।

বেডরুমটা দোতলায়। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল শহীদ। খাট, ড্রেসিং টেবিল, ডেস্ক, সোফা—বেডরুমের ভিতর এসবও রয়েছে। ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ড্রয়ার খুলে দেখল, কাগজপত্র ঠাসা। সেটা বন্ধ করে দিয়ে নিচের ড্রয়ারটা টেনে বের করল ও।

একটা ভাঁজ করা কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই দ্বিতীয় ড্রয়ারে। কৌতূহলবশত কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল শহীদ।

একটা হ্যান্ডনোটের অরিজিন্যাল কপি কাগজটা। হ্যান্ডনোটের লেখা পড়ে জানা গেল, আজহার মল্লিক কোত্থেকে টাকা সংগ্রহ করে অফিসে জমা দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর হোসেন আজহার মল্লিককে বিনা সুদে নগদ দশ হাজার টাকা ধার দিয়েছে। এই হলো হ্যান্ডনোটের সারমর্ম।

শহীদ আশ্চর্য হয়ে ভাবল, আজহার মল্লিকের প্রতি এত সদয় হলো

কেন জাহাঙ্গীর হোসেন? দশ হাজার টাকা ধার কেন দিল সে?

এদিক ওদিক ভাল করে দেখছিল শহীদ, হঠাৎ চোখ পড়ল একটা পিতলের থালার উপর। কার্পেটের একধারে পড়ে আছে থালাটা। থালার উপর এক গাদা পোড়া কাগজ।

চিন্তিতভাবে পোড়া কাগজের দিকে তাকিয়ে ছিল শহীদ, এমন সময় কোকিলের ডাক কানে ঢুকল তার।

চমকে উঠে দ্রুত আলো নিভিয়ে দিল ও। কামাল সঙ্কেত দিচ্ছে। তার মানে বাড়িতে ঢুকেছে কেউ।

আলো নিভিয়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে সিঁড়ির মাথায় চলে এল শহীদ। অন্ধকার সিঁড়ির চার পাঁচটা ধাপ নামতেই নিচে থেকে একজন পুরুষের কর্কশ স্বর ভেসে এল, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই ওপরে কোথাও আছে! তুমি দাঁড়াও, দেখছি আমি।'

অপর একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ফারুক, সাবধান! ব্যাটার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে!'

দেয়ালের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল শহীদ সিঁড়ির ধাপের উপর। ফারুক উঠে আসছে, আবছা মত দেখতে পাচ্ছে ও।

ফারুক কাছাকাছি আসতেই সবুট লাথি মারল শহীদ। লাথিটা লাগল ফারুকের পায়ে, ছিটকে পড়ল সে রেলিং-এর গায়ে। তারপর কি হলো তার অবস্থা তা দেখার জন্যে অপেক্ষা না করে লাফ দিয়ে ধাপ ক'টা টপকে দোতলার করিডরে পৌঁছে গেল। এক ছুটে বেডরুমের ভিতর ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

বাগানের দিকে জানালার শার্সি খুলছে শহীদ, সিঁড়ি থেকে ফারুকের চিৎকার ভেসে এল; 'শয়তানটা বাগানে লাফিয়ে নামতে পারে! জাহাঙ্গীর, বাগানে ছুটে যাও তুমি।'

শহীদ ইতোমধ্যে শার্সি খুলে ফেলে লাফ দিয়েছে অন্ধকারে। ফারুক এবং জাহাঙ্গীর বাগানে পৌঁছবার আগেই বাগানের পাঁচিল টপকে পাশের বাড়িতে চলে গেছে ও।

আজহার মল্লিকের বাড়িতে নেমে শহীদ দেখল, বাগানের মধ্যে দিয়ে একটি যুবতী হলঘরের দরজার দিকে মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে। দু'বোনের একজন হবে, ভাবল শহীদ. এই মাত্র গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছে।

দ্রুত এগিয়ে গেল শহীদ। কাছাকাছি গিয়ে চাপা কণ্ঠে ডাকল. 'শুনছেন!'

'কে?' আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল তসলিমা, 'কে আপনি?'

'আমি শহীদ খান। চেঁচাবেন না, ভয়ের কিছু নেই।'

তসলিমা অবাক হয়ে বলল, 'এত রাতে···বাড়িতে ঢুকলেন কিভাবে?'

শহীদ বলল, 'পরে শুনবেন। আগে হলঘরের দরজা খুলুন, আমাকে ভিতরে নিয়ে চলুন। চাবি আছে আপনার কাছে?'

'তা আছে।'

তালা খুলে ভিতরে ঢুকল তসলিমা। শহীদও ঢুকল তার পিছু পিছু।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

এমন সময় দোতলা থেকে আজহার মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? তসলিমা নাকি?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'এত রাত করে বাড়ি ফিরলি! ভাল! তোর জন্যেই আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে দেখতে পাচ্ছি।'

মিসেস আজহার বললেন, 'হ্যাঁরে, জাহাঙ্গীরের বাড়িতে চোর

ঢুকেছে বলে মনে হলো। কিছু শুনলি গেট দিয়ে আসার সময়?'

তসলিমা বলল, 'কই, না তো!'

উপর থেকে আর কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। তসলিমা ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে পা বাড়াল লাইব্রেরী রুমের দিকে।

শহীদ তসলিমার পিছু পিছু লাইব্রেরী রুমে ঢুকল।

'কি হয়েছে বলুন এবার।'

শহীদ বলল, 'চোর নয়, আমি ঢুকেছিলাম জাহাঙ্গীর সাহেবের বাড়িতে। পালাবার জন্যে পাঁচিল টপকে আপনাদের বাড়িতে নেমে পড়ি। আপনাকে দেখে কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে হয়, তাই ডাকি। ভাল কথা, আমি যে কেন এ পাড়ায় এসেছিলাম কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলবেন না যেন।'

তসলিমা একটা চেয়ারের হাতলে বসে জানতে চাইল, 'কি জানতে চান আপনি?'

'আচ্ছা, হায়দার আলী কি আপনাকে...?' প্রশ্নের বাকি অংশটা ইচ্ছা করেই উচ্চারণ করল না শহীদ।

তসলিমার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু সে কথা আপনি জানলেন কি করে?'

'হায়দার আমাকে ফোন করেছিল। সে অনুমান করেছে, শামিমের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি অনুসন্ধান করছি।'

'কি বলল ফোনে হায়দার?'

শহীদ মুচকি হাসল। বলল, 'পরিষ্কার করে সে কিছুই বলেনি। তবে যা বলেছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেছে, সে আপনাকে ভালবাসে এখনও।'

লজ্জা রাঙা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে তসলিমা বলল, 'এসব

কথা থাক। ওর প্রতি অবিচার করেছি, সত্যি। কিন্তু সুবিচার যে করব, সে সময়ও আর নেই। আমি অনেক দূর চলে এসেছি।'

শহীদ বলল, 'দরকার হলে দূর থেকে আপনাকে কাছে টেনে আনবে হায়দার—সে যাক। এখন বলুন দেখি, শামিম আপনার কামরায় ঢুকেছিল কেন সে-রাতে?'

তসলিমা বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তর আমি তো দিয়েছি। কেন সে ঢুকেছিল, আমি জানি না।'

'আচ্ছা, কামরা থেকে কিছুই কি হারায়নি আপনার?'

'না—শুধু চিঠিটা ছাড়া আর কিছুই হারায়নি।'

শহীদ বলল, 'চিঠিটা কার লেখা? কাকে লেখা?'

'জাহাঙ্গীর ভাইয়ের লেখা। আমাকে। একটা বিদেশী সেন্ট চেয়েছিলাম শখ করে। বলেছিলেন, দেব। কিন্তু আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে অনেকদিন কেটে গেল, দিতে পারলেন না। তাই আমি অভিমান করেছিলাম জাহাঙ্গীর ভাইয়ের ওপর। দেখা হলেও কথা বলতাম না। তাই আমার অভিমান ভাঙানর জন্যে ক্ষমা চেয়ে তিনি একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই চিঠিটাই হারিয়েছে।'

'চিঠিটার কথা শামিম জানত?'

তসলিমা বলল, 'জানত। চিঠিটা আমি হলঘরে দাঁড়িয়ে পড়ি, পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিই। সেই সময় শামিম সেটা কুড়িয়ে পড়তে শুরু করে। রাগ করে ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওকে বলি, পরের চিঠি পড়তে নেই। এরপর চিঠিটা আমি রেখে দিই ব্যাগের ভেতর।'

'শামিম তা দেখে?'

'নিশ্চয়ই দেখেছিল।'

শহীদ বলল, 'রাত দুপুরে বিরক্ত করলাম, দুঃখিত। এবার আমি

যাব।'

নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল শহীদ পঁচিশ নম্বর বাড়ি থেকে। অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল কামাল। শহীদকে দেখে বলল, 'প্রেম করার শখ তো তোর মধ্যে দেখিনি কোনদিন…!'

'প্রেম করতে যাইনি, গিয়েছিলাম আর একজনের হয়ে প্রেমের বীজ পুঁততে।'

'তার মানে?'

শহীদ বলল, 'ইন্সপেক্টর হায়দার ফোন করেছিল বলিনি বুঝি তোকে? তবে শোন, হায়দার আমাকে বলেছে, সে তসলিমাকে ভালবাসে। সে চায় তসলিমাও যেন তাকে ভালবাসে। এ ব্যাপারে আমাকে সে ধরেছে, আমি যেন ওদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক তৈরি করে দিই।'

কামাল বলল, 'কী আশ্চর্য! হত্যাকাণ্ড এবং প্রেম—দুটো যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস!'

শহীদ বলল, 'কিন্তু হত্যাকাণ্ড যেমন সত্য প্রেমও তেমনি সত্য, অস্বীকার করতে পারবি না।'

পরদিন সকাল দশটায় গ্যাবার্ডিনের সাদা স্যুট পরে শহীদকে দেখা গেল ইন্সপেক্টর হায়দার আলীর অফিসে ঢুকতে।

সাদর আমন্ত্রণ জানাল হায়দার আলী, 'শহীদ ভাই, আপনি স্বয়ং! কি দরকার ছিল নিজে আসার, আমাকে ডেকে পাঠালেই আমি ছুটে যেতাম। বসুন, বসুন!'

শহীদ আসন গ্রহণ করে বলল, 'কিছু যেন ভাবছিলে?'

'হ্যাঁ। শহীদ ভাই, আমি ভাবছি…।'

শহীদ বাধা দিয়ে সহাস্যে বলল, 'জানি।'

'কি জানেন?'

'তুমি কি ভাবছিলে, বলব? তসলিমার পিছনে লোক লাগাবে কি না ভাবছিলে, যাতে এমদাদকে ধরা যায়, তাই না?'

'আপনি সর্বজ্ঞ! সেজন্যেই তো আপনাকে এমন শ্রদ্ধা করি। কাজটা কি ভুল হবে, শহীদ ভাই? তসলিমা খবর পেলে দেখা করবেই এমদাদের সাথে, আমি জানি।'

'কিন্তু, তার দরকার হবে না, হায়দার। শোনো, শামিম যে অফিসে কাজ করত, ঠিকানা জানো?'

'জানি।'

'তাহলে গাইড দেখে ফোন নাম্বারটা বের করে দাও আমাকে।'

'দিচ্ছি।'

ফোন গাইড টেনে নিয়ে নাম্বার খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইন্সপেক্টর হায়দার আলী। নাম্বারটা খুঁজে বের করে জানাল সে খানিকপর শহীদকে।

শহীদ ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল, বলল, 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান বলছি। বিশেষ একটা ইনফরমেশন দরকার আমার। শামিম সাহেব আপনাদের কোম্পানীতে চাকরি করতেন, তাই না?'

উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

'ব্যাঙ্কের কাগজপত্র কি তিনিই দেখা শোনা করতেন? কিংবা, ব্যাঙ্কে যাতায়াত করার দায়িত্ব কি তাঁর ওপরই ছিল?'

'তিনিই যেতেন ব্যাঙ্কে। কাগজপত্রও তাঁর মাধ্যমে যেত অ্যাকাউন্ট সেকশনে।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখার সাথে লেনদেনের কাজ করতেন?'

'ঠিক তাই।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে দিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে লাগল শহীদ। চোখ দুটো বন্ধ, কি যেন ভাবছে।

খানিকপর চোখ মেলে মৃদু হাসল শহীদ। বলল, 'হায়দার, পাগলা বিজ্ঞানী প্রফেসার রেহমানের আত্মহত্যার কেসটাও বোধ হয় তোমার হাতে ছিল, তাই না?'

'ছিল। কিন্তু, শহীদ ভাই···।'

শহীদ বলল, 'জানি কি বলতে চাইছ। প্রফেসার রেহমান আত্মহত্যা করেননি, এই তোমার সন্দেহ, তাই না? আমারও তাই সন্দেহ। না, সন্দেহ নয়, বিশ্বাস। প্রফেসার রেহমান খুন হয়েছেন। খুনীকে ধরতে চাও?'

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর হায়দার আলী, 'শহীদ ভাই, কী বললেন? কোথায়···কোথায় সে খুনী?'

'উত্তেজিত হয়ো না, উত্তেজিত হবার দরকার নেই।'

'খুনীকে ধরতে পারলে আমার প্রমোশন হবে, শহীদ ভাই!'

'প্রমোশন তোমার নানাক্ষেত্রে হবে। যেমন ধরো, প্রেমে। ভেব না। কেবল রহস্য ভেদ করাই নয়—ঘটকালীও আমার একটা নেশা। আমি হাতে নিয়েছি তোমাদের কেসটা।'

সাত

ছাব্বিশ নম্বর চক্রবর্তী লেন। বাড়ির ভিতর দ্বার রুদ্ধ করে বসে আছে জাহাঙ্গীর হোসেন এবং ফারুক চৌধুরী।

হুইস্কির বোতল থেকে গ্লাস দুটোয় আবার তরল পদার্থ ঢালতে ঢালতে জাহাঙ্গীর হোসেন বলল, 'তোমার কাছ থেকে সত্যি অনেক রকম উপকার পাচ্ছি আমি, ফারুক। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

ফারুক তার গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিল। বলল, 'কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞ হলেই তো আর চলবে না। ভেবে দেখো, তোমার অনুরোধে আমি কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলাম। হেড অফিস থেকে জরুরী কোন নির্দেশ ছিল না, তবু মিথ্যে কথা বলে মিস্ত্রীদেরকে সারারাত কাজ করতে বাধ্য করলাম।'

'উদ্দেশ্যটা কিন্তু পূর্ণ হলো না। টিকটিকি ব্যাটারা বেঁচে গেল ঠিকই। ঠিক আছে, এবার দেখব, কিভাবে তারা শামিমের খুনীকে ধরে।'

ফারুক বলল, 'গতকাল রাতেও তোমার জন্যে প্রাণটা হারাতে বসেছিলাম। লোকটা এমনভাবে লাথি মেরে ফেলে দিল আমাকে—সিঁড়ি দিয়ে যদি গড়িয়ে পড়তাম—বাঁচতে হত না।'

'আচ্ছা, কে হতে পারে লোকটা?'

ফারুক বলল, 'কে আবার, ওই টিকটিকি!'

জাহাঙ্গীর হোসেন জানতে চাইল, 'কিন্তু আমার বাড়িতে সে আসবে কেন?'

'তা আমি কি করে বলব? হয়তো সন্দেহ করেছে। এসব কথা এখন থাক। দেখো জাহাঙ্গীর, তোমার বিপদের সময় আমি নিজের প্রাণ

দিয়েও তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করব, সে প্রমাণ তুমি একাধিকবার পেয়েছ ইতিমধ্যেই। কিন্তু প্রতিদানে আমি কিছু চাই। মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যতই করো, ওতে আমি সন্তুষ্ট নই। একটা কথা মনে রেখো তুমি, আমি ফারুক চৌধুরী, শামিম কবির নই। শামিমটা ছিল বোকা, আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমি কিন্তু তা নই। যেমন সাহস আছে তেমনি বুদ্ধির ধারও আছে আমার।'

'তুমি যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'বলতে চাইছি, আমাকে তুমি আর যাই ভাব শামিমের মত বোকা এবং দুর্বল ভেব না। সোনার ডিম পাড়া হাঁস পেয়েছিল সে ঠিকই, কিন্তু প্রথম ডিমটা পকেটে যেতে না যেতে বেচারী প্রাণে মারা পড়ল। শামিম আসলে ভুল করেছিল, কিন্তু সে-ভুল আমি করব না। হাঁসটাকে কিভাবে প্রতিদিন ডিম পাড়াতে হয় সে কৌশল আমার জানা আছে।'

বাঁকা চোখে জাহাঙ্গীর তাকিয়ে ছিল ফারুকের দিকে। ফারুক থামতেই সে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার বক্তব্য।'

ফারুক বলল, 'যে চিঠি তুমি তসলিমাকে লিখেছিলে, শামিম সেটা দেখে। দেখেই তড়িঘড়ি তোমার কাছে এসে টাকা দাবি করে সে। চিঠিটা যে আগে হস্তগত করা দরকার, তা সে ভাবেনি। ওইখানেই ভুল করেছিল সে। যাক, আট হাজার টাকা তুমি তাকে দিলে। আমি সৌভাগ্যবশত জানালা দিয়ে সব দেখলাম এবং সব শুনলাম। শুনে, মাথায় বুদ্ধিটা খেলে। চিঠিটাই আসল জিনিস, সুতরাং সেটা হস্তগত করতে হবে। তাই করলাম। এদিকে গভীর রাতে শামিম চিঠি আনতে গেল তসলিমার কামরায়, খুন হয়ে গেল সে সেখানে। তা সে খুন হয়েছে, ভালই হয়েছে। চিঠিটা এখন আমার কাছে।'

পকেট থেকে বের করল ফারুক একটা কাগজ, 'এই দেখো—এটা

চিঠির ফটোস্ট্যাট কপি। আসলটা নিরাপদে রাখা আছে।'

'আমার কাছ থেকে কি চাও তুমি?'

'বখরা চাই। তোমার ব্যবসার আধাআধি অংশীদার করে নাও আমাকে, বন্ধু!'

জাহাঙ্গীর হোসেন চুপ করে রইল।

ফারুক সোফা ছেড়ে উঠল. 'দর কষাকষি দু'একদিন পরে হলেও ক্ষতি নেই। চলি, কেমন?'

ফারুক দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

জাহাঙ্গীর হোসেন রাগে, ঘৃণায় সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে মতলব আঁটতে লাগল সে, কিভাবে শায়েস্তা করা যায় ফারুককে।

পরদিনের ঘটনা। রাত তখন ন'টা। চক্রবর্তী লেনের ভিতর ক্রিমসন কালারের একটা ফোক্স ওয়াগেন ঢুকল।

ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির কাছাকাছি থামল গাড়িটা। দরজা খুলে গেল দু'দিকের। একদিক থেকে নামল সুদর্শন, সুবেশ প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। অপর দরজা দিয়ে নামল তরুণ পুলিস ইন্সপেক্টর হায়দার আলী।

এদিক ওদিক দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে কামালকে কোথাও দেখতে না পেয়ে শহীদ অবাক হয়ে গেল। সন্ধ্যার খানিক আগে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে কামালকে পাঠিয়েছে সে ছাব্বিশ নম্বর বাড়িটার উপর নজর রাখার জন্যে।

পঁচিশ নম্বর বাড়ির ভিতর আলো জ্বলছে। কিন্তু চব্বিশ নম্বর বাড়ি অন্ধকারে ঢাকা। ছাব্বিশ নম্বরের অবস্থাও তাই।

শহীদ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল সাতাশ নম্বর বাড়ির দরজার দিকে। কড়া ধরে নাড়ল ও খানিকক্ষণ।

এক প্রৌঢ়া মহিলা দরজা খুলে দিয়ে জানতে চাইলেন, 'কাকে চাই?'

শহীদ বলল, 'আপনার পাশের বাড়ির জাহাঙ্গীর সাহেব বাড়িতে আছেন কিনা বলতে পারেন? বাড়ির ভেতর দেখছি আলো-টালো নেই।'

প্রৌঢ়া বললেন, 'সন্ধ্যার সময় জাহাঙ্গীর তার মোটর গাড়িতে জিনিসপত্র, সুটকেস-বাক্স তুলে নিয়ে চলে গেছে। তার সাথে এ পাড়ার আকরাম হোসেন চাকলাদারও ছিল।'

শহীদ বলল, 'কোথায় গেছেন ওরা বলতে পারেন?'

'না।'

'আচ্ছা, জাহাঙ্গীর সাহেব বেরিয়ে যাবার আগে তার বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেখেছিলেন?'

'কই, না···হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটা ফেরিওয়ালা এসেছিল আমার বাড়িতে, এখান থেকে সে জাহাঙ্গীরের বাড়িতে গিয়ে ঢোকে।'

'তাকে বেরুতে দেখেননি?'

'না। দরজায় ছিলাম না বেশিক্ষণ।'

ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল শহীদ। বলল, 'হায়দার, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি জাহাঙ্গীরের বাড়িতে কামালকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির ভিতর ঢুকে শহীদ দেখল দামী-দামী প্রায় সব জিনিসপত্রই অদৃশ্য হয়ে গেছে। ড্রয়িংরুমে একটা রুমাল পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল সেটা ও।

রুমালে ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধ পেল ও। কিচেনে ঢুকল এরপর

শহীদ। কামালকে হাত-পা বাঁধা, মুখে তুলো গোঁজা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো ও।

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কামাল খানিক আগেই। তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল এবং মুখ থেকে তুলো বের করে নিল ও।

কামাল বলল, 'ওরা গেছে নারায়ণগঞ্জে। এখলাসপুরে ওদের লঞ্চ অপেক্ষা করছে, হংকং-এর উদ্দেশে রওনা হবে আজ রাতেই।'

কামালকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে শহীদ জানতে চাইল, 'তোর এ অবস্থা হলো কেমন করে?'

'শিশি-বোতলের ঝুড়ি মাথায় করে ভেতরে ঢুকতেই পেছন থেকে কে যেন আমার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরে...'

'রুমালে ক্লোরোফর্ম ছিল।'

'তারপরে আমার আর কিছু মনে নেই।'

শহীদ বলল, 'ক্লোরোফর্মে রুমাল ভিজিয়ে ওরা তৈরি হয়ে ছিল। কার জন্যে? নিশ্চয়ই তোর জন্যে নয়?'

'না, আমার জন্যে কেন—ওরা জানবে কিভাবে আমি আসব?'

শহীদ বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তর আছে, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, পঁচিশ নম্বর বাড়িতে। আয়, দেখা যাক।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা।

'কামাল, তুই হায়দারের সাথে এখানেই থাক। এখুনি আসছি আমি।'

শহীদ হন হন করে এগিয়ে গিয়ে পঁচিশ নম্বর বাড়ির গেট খুলে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জানালা দিয়ে আতিয়া দেখতে পেয়েছিল শহীদকে। হলঘরের দরজা খুলে দিয়ে সে বলল, 'আসুন, মি. শহীদ।'

শহীদ ভিতরে ঢুকল। বলল, 'বসব না। বাড়িতে কে কে আছেন,

বলুন তো?'

'কেউ নেই, আমি ছাড়া। কেন বলুন তো?'

'কোথায় গেছেন সবাই?'

আতিয়া বলল, 'মা এবং আব্বা গেছেন আমাদের এক আত্মীয়র বাড়ি। সন্ধ্যার সময় তসলিমা একটা চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে বেরিয়ে গেছে।'

'চিঠি? কে চিঠি পাঠিয়েছিল?'

'কে পাঠিয়েছিল তা তসলিমা বলেনি আমাকে। তবে হাতের লেখাটা আমার চেনা। চিঠিটা পড়ে সে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। ওই তো, দেখুন।'

বাজে-কাগজের ঝুড়ি থেকে ছেঁড়া চিঠিটা তুলে নিয়ে এসে দিল আতিয়া শহীদকে। বলল, 'এটা এমদাদ নামে এক লোকের লেখা।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু চিঠির কাগজ আমার চেনা, এ তো জাহাঙ্গীর হোসেনের! আচ্ছা, ফারুক সাহেব কোথায়?'

'তসলিমা চলে যাবার পর এসেছিল, এসেই চলে গেল হাতে একটা সুটকেস নিয়ে।'

'কোথায়?'

'তা আমি কি করে বলব?'

শহীদ বলল, 'দেখুন তো, মিস তসলিমার কামরায় তার সুটকেস আছে কিনা? ফারুকের কামরাটাও দেখবেন।'

উপরে উঠে গেল আতিয়া। মিনিট দুয়েকের মধ্যে নেমে এল আবার নিচে। বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার! ফারুক ভাইয়ের দুটো সুটকেসই রয়েছে। অথচ তসলিমার সুটকেসটা নেই।'

শহীদ হঠাৎ চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল দরজার দিকে। বলল,

'হঠাৎ একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে···।'

গাড়িতে ফিরে এল শহীদ। দ্রুত স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে। বলল, 'এমদাদকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে জাহাঙ্গীর হোসেন তসলিমাকে বাড়ি থেকে বের করে সাথে করে নিয়ে গেছে। রুমালে ক্লোরোফর্ম তোর জন্যে নয় কামাল, তসলিমার জন্যে ঢালা হয়েছিল। আর ফারুকও ভিড়েছে জাহাঙ্গীরের দলে। আমার সন্দেহ, তসলিমার ঘাড়ে শামিমের হত্যার দায় চাপাবার ষড়যন্ত্র করছে ওরা সবাই।'

'লঞ্চ যদি ছেড়ে দিয়ে থাকে···।'

শহীদ বলল, 'মনে হয় মধ্যরাতের আগে ছাড়বে না। জলপুলিসের সাহায্য নিতে হবে, যদি গিয়ে দেখি লঞ্চ নেই।'

তীরবেগে ছুটছে ফোক্সওয়াগেন নারায়ণগঞ্জের দিকে। স্পীডমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে।

তীব্র বাতাসে চুল উড়ছে ওদের তিনজনের।

রাত ন'টা বেজে তখন দশ মিনিট হয়েছে। যাত্রাবাড়ির তেমাথায় হাতে সুটকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফারুক চৌধুরী। ঘন ঘন রিস্টওয়াচ দেখছে সে। অস্থির, চঞ্চল দেখাচ্ছে তাকে।

এমন সময় দেখা গেল শহরের দিক থেকে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। ফারুক দাঁড়িয়ে রইল, তার গায়ে হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোর বন্যা এসে পড়ল।

গাড়িটা ব্রেক কষে দাঁড়াল ফারুকের সামনে। গাড়ির ভিতর অন্ধকার। এক পা এগিয়ে ফারুক প্রশ্ন করল, 'বন্ধু, আছ?'

'আছি বৈকি।'

দরজা খুলে নিচে নামল জাহাঙ্গীর হোসেন। তার হাতে একটা

উদ্যত রিভলভার।

'ভেতরে ওঠো, নয়তো গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

ভয়ে দিশেহারা ফারুক সুড়সুড় করে গাড়িতে উঠে বসল। জাহাঙ্গীরও উঠল তার পিছু পিছু। দরজা বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির।

জাহাঙ্গীর হোসেন বলল, 'চাকলাদার, গাড়ি ছাড়ো।'

পাশে বসা ফারুকের দিকে তাকাল জাহাঙ্গীর। ধূর্ত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, 'কী? আধাআধি বখরা নেবে না? বন্ধু, ভুল একা শামিমই করেনি, তুমিও করলে।'

আট

আধঘণ্টা পর নির্জন ধলেশ্বরী নদীর কাছে থামল গাড়িটা। নদীর জলে বিরাটাকার একটা লঞ্চ নোঙর ফেলে ভাসছে। কোন মানুষজন দেখা যাচ্ছে না, ভিতরটাও অন্ধকার।

একদিকে নদী, অপরদিকে তেপান্তরের মাঠ, জলাভূমি।

নদীর পাড় থেকে খানিক দূরে কয়েকটা শিমুল গাছ। সেই গাছের পাশে একটা একচালা কুঁড়েঘর। চাকলাদার গাড়ি থামিয়েছে ওই কুঁড়েঘরের সামনেই।

প্রথমে নামল চাকলাদার। জাহাঙ্গীর তাকে ঘর খোলার চাবি দিয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছে। ঘরের তালা খুলে হারিকেন জ্বালল সে, ফিরে এল গাড়ির কাছে।

রিভলভার হাতে নিয়ে এরপর নামল জাহাঙ্গীর হোসেন। বলল, 'কই রে, শালা ফারুক, নামলি না এখনও?'

বিনাবাক্যব্যয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ফারুক। জাহাঙ্গীর বলল, 'ওই ঘরের ভেতর ঢোক।'

ফারুক পা বাড়াল। পিছন থেকে পিঠে রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা মারল জাহাঙ্গীর, 'শালা বলে কিনা আধাআধি বখরা নেব! নে, কত নিবি নে!'

বলেই জুতোসহ পা দিয়ে ফারুকের পিছনে সজোরে লাথি মারল জাহাঙ্গীর।

লাথি খেয়েও পড়ল না ফারুক, কোনমতে সামলে নিল সে আছাড় খাওয়া থেকে। ঘরের ভিতর নিঃশব্দে ঢুকে দাঁড়াল এক পাশে।

'চাকলাদার, জ্ঞান ফেরেনি তসলিমার?'

'না।'

'দু'জন ধরাধরি করে নিয়ে এসো ওকে।'

নির্দেশ পেয়ে গাড়ির ভিতর থেকে তসলিমার জ্ঞানহীন দেহটা বের করল চাকলাদার এবং এমদাদ। পাঁজাকোলা করে ঘরের ভিতর নিয়ে এল তসলিমাকে এমদাদ।

'শুইয়ে দাও একধারে।' কথাটা বলে জাহাঙ্গীর তাকাল ফারুকের দিকে।

ফারুক এই প্রথম কথা বলল, 'কি করতে চাও তুমি আমাকে নিয়ে?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল জাহাঙ্গীর। বলল, 'এটা একটা প্রশ্ন হলো? এই শালা, কি করব তোর মত কুকুরকে নিয়ে তা আবার জিজ্ঞেস করার বিষয়? খুন করব, এক্ষুণি গুলি করে মেরে ফেলব তোকে।'

ফারুক দরদর করে ঘামছে। ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে জাহাঙ্গীরের হাতে ধরা রিভলভারটার নলের দিকে। লোলুপ দৃষ্টিতে নলটা যেন

তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে।

'কিন্তু আমাকে খুন করে কি লাভ হবে তোমার? আমি যদি আর না ফিরি, কিংবা পুলিস যদি কোনদিন আমার লাশ আবিষ্কার করে, নিঃসন্দেহে তারা আমার কামরার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখবে। দেখার সময় তাদের চোখে তোমার লেখা চিঠিটাও পড়বে। তোমার হাতের লেখা দেখে তারা ঠিকই বুঝে নেবে···।'

'বুঝল, তাতে ক্ষতি কি আমার? আমি চলে যাচ্ছি হংকঙে, জীবনে আর ফিরব না এদেশে।'

ফারুক বলল, 'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। আচ্ছা, তসলিমাকে নিয়ে এসেছ কেন? তাকেও তুমি খুন করবে?'

জাহাঙ্গীর গম্ভীর হয়ে বলল, 'না। ওকে আমি অনেকদিন থেকে ভালবাসি। ওকে আমি বিয়ে করব। তাই এনেছি।'

এই সময় তসলিমা একটু নড়ে উঠল। জাহাঙ্গীর সেদিকে তাকাতেই, ফারুক সুযোগটা নেবার চেষ্টা করল। বিদ্যুৎবেগে পা তুলে লাথি চালাল সে।

কিন্তু জাহাঙ্গীর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তড়াক করে লাফ দিয়ে পিছন দিকে সরে গেল খানিকটা, সরে গিয়েই গুলি করল।

ফারুকের বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল তপ্ত বুলেট, পিঠে মস্ত একটা গর্ত সৃষ্টি করে। ধরাশায়ী হলো ফারুক সশব্দে।

নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে রইল স্থির হয়ে মাটির মেঝেতে।

বারুদের গন্ধ ঘরে।

'কি হলো! কিসের শব্দ ওটা?' ধড়মড় করে উঠে বসল তসলিমা।

'কেউ নড়েছ কি মরেছ!'

কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল অকস্মাৎ কেউ। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে

ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল শহীদ, কামাল, পুলিস ইন্সপেক্টর হায়দার আলী। ওদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত রিভলভার।

কামাল তার রিভলভারের নল চেপে ধরল জাহাঙ্গীরের পিঠে। স্থির, নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে জাহাঙ্গীর দরজার দিকে পিছন ফিরে। এমদাদ এবং চাকলাদার নির্দেশ না পেলেও, মাথার উপর দু'হাত তুলে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

শহীদ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল জাহাঙ্গীর হোসেনের সামনে। 'ফেলে দাও হাতের রিভলভার।'

জাহাঙ্গীর ফেলে দিল রিভলভার।

শহীদ বলল, 'হায়দার, স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের পলাতক ম্যানেজার, প্রফেসার রেহমানের হত্যাকারী, শামিম কবিরের হত্যাকারী এবং ফারুক চৌধুরীর হত্যাকারী আবদুর রহিমকে গ্রেফতার করো। জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে আবদুর রহিম, সত্যি, অনেক খেলা দেখিয়েছ তুমি আমাদেরকে। কিন্তু যা হয় শেষ পর্যন্ত তাই হলো, শেষরক্ষা তুমি করতে পারলে না!'

ইন্সপেক্টর হায়দার অবাক বিস্ময়ে বলল, 'শহীদ ভাই, এই লোককে আপনি আবদুর রহিম বলছেন? কিন্তু স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আবদুর রহিমের চেহারার সাথে এর যে কোন মিলই নেই! আমি তার ছবি অন্তত এক লক্ষবার দেখেছি···।'

শহীদ বলল, 'চেহারার মিল তুমি পাবে না, হায়দার। তার কারণটা বলছি। আবদুর রহিম ব্যাঙ্কের বিশ লক্ষ টাকা চুরি করে, তারপর সে যায় প্রখ্যাত নিউরো সার্জেন প্রফেসার রেহমানের কাছে। ভয় দেখিয়ে সে প্রফেসার রেহমানকে বাধ্য করায় প্লাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে তার চেহারা বদলে দিতে। প্রফেসার রেহমান চেহারা বদলে দেন আবদুর

রহিমের। নতুন চেহারা, নতুন নাম গ্রহণ করে আবদুর রহিম। আবদুর রহিম হয় জাহাঙ্গীর হোসেন। প্রফেসার রেহমান তার প্রকৃত পরিচয় জানেন, সুতরাং তাঁকে খুন করে সে, যাতে ধরা পড়ার শেষ ভয়টাও আর না থাকে।'

'বুঝেছি।'

হায়দার আলী এগিয়ে এসে জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে আবদুর রহিমের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

শহীদ বলল, 'ফারুককে হয়তো বাঁচানো যেত আরও খানিক আগে পৌঁছুলে। কিন্তু গুলির শব্দ না হলে তো এই কুঁড়েঘর খুঁজেই পেতাম না। ফারুক—সে-ও নিজের দোষে খুন হলো। শামিম যে পথে পা বাড়িয়ে খুন হয়েছিল, ফারুকও সেই পথে পা বাড়াতে…।'

কামাল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু শামিম কেন খুন হলো? শামিমের হত্যা এখনও আমার কাছে একটা রহস্য হয়ে রয়েছে।'

শহীদ বলল, 'সব রহস্যের সমাধান বের করে ফেলেছি আমি। শামিম খুন হয়েছে লোভে পড়ে। শোনো তবে, স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আবদুর রহিমের হাতের লেখা পরিচিত ছিল শামিমের। কেননা, শামিম যে অফিসে চাকরি করত সেই অফিসের সাথে স্বর্ণালী ব্যাঙ্কের লেনদেন ছিল। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাশোনা করত শামিমই। সুতরাং আবদুর রহিমের হস্তাক্ষরের সাথে পরিচিত ছিল সে।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু…।'

শহীদ বলল, 'সব কথা বলতে দে আমাকে আগে। জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে আবদুর রহিম নতুন নামে, নতুন চেহারায় বসবাস শুরু করেছিল চক্রবর্তী লেনের ছাব্বিশ নম্বর বাড়িটা কিনে নিয়ে। ঘটনাচক্রে, পাশের বাড়ির মিস তসলিমাকে যেদিন সে চিঠি লেখে সেদিনই শামিম

উপস্থিত হয় তসলিমাদের বাড়িতে। চিঠিটা সে দেখে। দেখেই আবদুর রহিমের হাতের লেখা চিনতে পারে সে। যেভাবেই হোক, খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারে পাশের বাড়িতেই থাকে জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে আবদুর রহিম। মিস তসলিমাদের বাড়ি থেকে সোজা সে জাহাঙ্গীর হোসেনের বাড়িতে যায়। জাহাঙ্গীরকে সে বলে, 'তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি, চেহারা বদলালে কি হবে, হাতের লেখা তো আর বদলাওনি।' স্বভাবতই জাহাঙ্গীর ভয় পেয়ে যায়। পুলিস জানলে ধরে নিয়ে যাবে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ফাঁসি হবে তার। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে সে শামিমের।'

কামাল বলল, 'এতক্ষণে বুঝলাম।'

হাতকড়া পরানো হলো সবার হাতে।

শহীদ চাকলাদার এবং এমদাদের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'হায়দার, এদের দু'জনকে থানায় নিয়ে গিয়ে খাতির-যত্ন করো। যতক্ষণ না গড়গড় করে সব কথা বলে ততক্ষণ চালিয়ে যাবে। এরা শত শত কুকর্মের ভাগীদার। এদের কাছ থেকে তুমি অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে···আরে! মিস তসলিমা! আপনি কাঁদছেন কেন? ওহে, হায়দার, ওকে একটু সান্ত্বনা দাও!'

শহীদ হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল কুঁড়েঘর থেকে বন্দী তিনজন ও হতচকিত কামালকে ঠেলে নিয়ে।

● ● ●